২৬৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

শ্রাবণ ১৪২৩
জুলাই ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৬৬ শ্রাবণ ১৪২৩ জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

০৫ **মোঃ আব্দুল আজিজ মুন্সী**
প্রাথমিক শিক্ষা ও স্থানীয় জনঅংশগ্রহণ

১০ **শহীদুল্লাহ শরীফ**
সমাপনী পরীক্ষার চাপ ও নেতিবাচক প্রভাব:
শিশু ও শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

১৪ **অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ**
সার্বিক প্রতিরোধ গড়ার এখনই সময়

১৭ **দিল মনোয়ারা মনু**
মুক্তিযুদ্ধে এক লড়াকু সৈনিক শিরিন বানু মিতিল

১৯ **শর্বরী আলোময়ী**
শিক্ষা বিষয়ে (২) শিক্ষকের (৩) গ্রন্থ

২৩ **বিশেষ প্রতিবেদন**
গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর এডুকেশন ২০১৬
স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচি

২৪ **বিশেষ প্রতিবেদন**
চাকরি মেলা ২০১৬

২৬ **তথ্যকণিকা**

২৮ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল কর্মবহুল ও বর্ণাঢ্য এক জীবনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ২১ জুলাই ২০১৬ পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তলোকে। তিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারালো। এ ক্ষতি কখনও পূরণ হবার নয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। আমাদের স্মৃতিপটে তাঁর স্থান চিরকাল জাগরুক থাকবে।

শিরিন বানু মিতিল

শিরিন বানু মিতিল স্মরণে

আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিরিন বানু মিতিল, পরিচালক, জেণ্ডার এণ্ড গভর্নেন্স, প্রিপ ট্রাস্ট-এর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সবাই গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখে রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী জনাব মাসুদুর রহমান, কন্যা জয়া তাসনীম রহমান, তন্বী নওশিন, জামাতা রাহিন মজুমদার, পুত্র তাহসিনুর রহমান, জায়া সাবরিনা সোহানীসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, অনুসারী ও সহকর্মী রেখে গেছেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ২২ জুলাই ২০১৬ তারিখে এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একমাত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা শহরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের কাছে এবং ২২ এপ্রিল ১৯৭১, নগরবাড়ী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কাছের সম্মুখ যুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাশিয়ায় যান। সেখানে তিনি পিপলস্ ফ্রেণ্ডশীপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে তিনি উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এ উন্নয়ন কর্মী হিসেবে কাজে যোগদান করেন এবং ১৯৮৭ সালে একই কাজের সুবাদে আবার ঢাকায় চলে আসেন। শিরিন বানু মিতিল ১৯৯৬ সালে প্রিপ ট্রাস্টে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু প্রায় দু'দশক এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন প্রিপ ট্রাস্টের 'বাতিঘর'।

শিরিন বানু মিতিল একজন জাতীয়তাবাদী, দেশভক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবাধিকার কর্মী এবং একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। শিরিন বানু মিতিলকে গভীর সম্মান এবং ভালবাসার সঙ্গে সব সময় স্মরণ করা হবে। তাঁর স্বর্গীয় হাসি এবং সুমহান উপস্থিতির অভাব চিরকাল অনুভব করবো।

আরোমা দত্ত

নব্বই-এর দশক থেকে উন্নয়নকর্মী হিসেবে আমরা ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার প্রতি ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। আমার স্ত্রী ও মিতিল ছিল খুব ভাল বন্ধু। পারিবারিক পর্যায়ে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। মিতিলের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই আমি তার মা সেলিনা বানুকে চিনতাম। সেলিনা আপা ছিলেন ষাটের দশকের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনি ছিলেন আমাদের নেত্রী। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে তিনি যুক্ত ফ্রন্ট থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শিরিন বানু মিতিলের অবদান এবং তার স্মৃতি চিরঅক্ষয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত অংশগ্রহণের জন্য তাকে সালাম জানাই।

শামসুল হুদা

সামাজিক রীতি উপেক্ষা করে মিতিল যে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল সেকথা বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। নিজের জীবনের নিরাপত্তারা কথা না ভেবে সে দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য বীরোচিত একটা ভূমিকা নিয়েছিল। নিজের ব্যক্তিজীবনের সংগ্রামের সঙ্গে মানুষের জন্য তার ভূমিকা অতুলনীয়। কিভাবে পরিবার বা বড় পরিসরের জন্য আপোস করতে হয়, তা যেন তার ক্ষেত্রে কিংবদন্তীসম। আমাদের ইতিহানে ওর নাম নারী-মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ও বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে থাকবে। নিত্যদিন যাদের সঙ্গে দেখা হয়, মিতিল তেমন কোন সাধারণ নারী ছিল না।

সংস্কারহীন, পক্ষপাতমুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক একটা মানুষ। কখনও তাকে এমনকি হালকা চালেও কোন পরচর্চা বা কারো সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা বলতে শুনিনি। কোন পক্ষ গ্রহণে বাধ্য হলে, সে সেটাও এমন শান্ত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে করত যে, তার মধ্যে কোন নিন্দা বা তিক্ততা থাকত না, তা কাউকে আহত করত না, কোন দূরত্ব সৃষ্টি করত না কারো সঙ্গে। দুর্লভ একটা গুণ, শেখার মত। এই অসাধারণ নারীর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। মিতিল কখনও হারিয়ে যাবে না, কখনও ভুলব না তাকে।

খুশি কবির

এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং যে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, সে আজ আর বেঁচে নেই, তার সঙ্গে আর কোনোদিন আমার আর দেখা হবে না, ঐ সদাহাসি, অমন আন্তরিক, সততাপূর্ণ, একটা মুখ আমি আর দেখবো না এমন সত্য মেনে নেয়া খুব কষ্টকর।

আমি তাকে একজন দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখেছি, এমন সাহসিক এক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে থেকেছি। মনে হতো, ও ছিল লোকগাথার এক চরিত্র। দেশ রক্ষায় পুরুষের পোষাকে এক তরুণী নারী। এক বছরের জন্য প্রিপে যখন কাজ করেছি তখনি তার সঙ্গে আমার আলাপ এবং মনে হয়েছে সে অন্যদের চেয়ে অনেক বড়। মানুষের মধ্যে যা কিছু সৎ এবং ভালো তার মধ্যে তার সবই ছিল। সাধারণ হিংসা, ঈর্ষা এবং বৈষয়িক আয়েশের জন্য যতসব চেষ্টা, এসবের অনেক উর্ধ্বে ছিল সে। সত্যিই সে আমাদের এক বীর নারীযোদ্ধা এবং তার এই পরিচয় চিরজীবী থাকবে। দেশের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে সে এবং প্রতিদানে কিছু চায়নি এমন এক স্মৃতি হয়েই সে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। কতিপয় মানুষের জন্য নয়, সবার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রাম কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

কোনো একদিন অন্য কোথাও আমার সঙ্গে দেখা হবে, ততোদিন শান্তিতে ঘুমাও। তোমাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই।

শাহীন আনাম

শিরিন বানু মিতিলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন। তার সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অমন একজন নারী-মুক্তিযোদ্ধার কাছে নিজেকে সর্বদাই ক্ষুদ্র মনে হত। একটা কথা ভেবে আজ ভাল লাগছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার সময় আমি শিরিন বানু মিতিলকে আমাদের বিভাগে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমার নেতৃত্বে সেদিন অন্যান্য সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা তাকে আনুষ্ঠানিক গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করেছিল। বিভাগের জন্য সেটা ছিল সত্যিই একটাঅন্যরকমের দিন।

শফি আহমেদ

মোঃ আব্দুল আজিজ মুন্সী

প্রাথমিক শিক্ষা ও স্থানীয় জনঅংশগ্রহণ

মানুষের কর্মকান্ড রয়েছে কাজ আর চিন্তা-ভাবনা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। আর এজন্য মানুষের প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা। যুগে যুগে শিক্ষাই মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। মানসম্মত শিক্ষার সাহায্যেই সমাজের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানবসত্তার পূর্ণবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ঘরের ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার মই হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা যা মানুষকে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছে দিতে পারে। তবে শিক্ষা অনেককেই মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে পারে না। তাই তারা শিশু ও নারী নির্যাতন করে, খুন করে, দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, খাদ্যে বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে মানুষের জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এসব যে অপরাধ এই বোধশক্তি ওদের মধ্যে গড়েই ওঠে না যথাপোযুক্ত শিক্ষার ঘাটতি থাকায়।

'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক ১৯৯০ সালের বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে,'শিক্ষা এক নিরাপদ, স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধিশালী এবং পরিবেশগতভাবে নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত করতে পারে। একই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, সহনশীলতা, এবং অন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জনে অবদান রাখতে পারে।' 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক এই ঘোষণায় স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৯২ সাল থেকে আমাদের দেশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। কিন্তু এতদিনেও দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষার দ্বার অবারিত নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ এবং এর উপর ভিত্তি করেই জাতীর শিক্ষার সৌধ তৈরী হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাই ভবিষ্যতের মানুষটির ভিত্তি তৈরী করে দেয়।

আমাদের দেশে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশী। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। একটি গতিশীল সমাজের প্রাণকেন্দ্র হলো সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করা হয়েছে এবং ৩৭৬৭২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমেদিত কারিকুলামের আলোকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস,

সজ্জিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের ন্যুনতম মানদণ্ড ঠিক করা হয়েছে। দেশে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মেয়েদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধে সরকার গরিব ও মেধাবী ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই টাকা পেয়ে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিষ্টার্ড নার্সারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ধাপে ধাপে জাতীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনে ৩য় ধাপে সকল বিভাগ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয় যা ০১ জুলাই ২০১৩ সাল থেকে কার্যকর হয়, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনে বিদ্যালয় জাতীয়করণ ৩য় ধাপ- যা ১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল থেকে কার্যকর হয়, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের আরও ২৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে যা ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের ২৭ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে যা ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল থেকে কার্যকর করা হয়। (তথ্য: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর ওয়েব-সাইট)। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন , ১৯৭৪ এর ৩ (১) ধারার ক্ষমতা বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হয়েছে। অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়সমুহের জমি, নগদ তববিলসহ যাবতীয় সম্পদ সরকারের অনুকূলে হস্তান্তর ও ন্যস্ত বলে গণ্য হয়েছে। বিদ্যালয়সমুহের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকার পদ সৃষ্টি এবং বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। যাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই তাদের ৩ বছরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিওন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিমার্জিত করা হয়েছে এবং পরিমার্জিত শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা এখন প্রায় ১০০% হয়েছে, মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, মেয়েদের বিদ্যালয় গমনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েরা ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে, বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং উত্তীর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে ৮২ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। (তথ্য: দৈনিক প্রথম আলো, ২০এপ্রিল, ২০১৬)। গত বছরের ২৭ হাজার ৫০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮২ হাজার ৫০০ জন হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং উত্তীর্ণদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২২-৩০ নভেম্বর ২০১৫ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় মোট ৩২ লাখ ৫৪ হাজার ৫১৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে (তথ্য: দৈনিক করতোয়া, ৩১/১২/১৫)। তার মধ্যে প্রাথমিক এ ২৯ লাখ ৪৯ হাজার ৬৩ জন (ছাত্রী ১৩ লাখ ৫৬ হাজার ৫৫৫ জন, ছাত্র ১৫ লাখ ৫২ হাজার ৫০৮ জন) এবং ইবতেদায়ীতে ৩ লাখ ৫ হাজার ৪৫১ জন (ছাত্রী ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯০ জন, ছাত্র ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৬১ জন)। ২০১৪ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ৩০ লাখ ৯৫ হাজার ৩২১ জন অংশ নিয়েছিল। (তথ্য: দৈনিক করতোয়া ২২ নভেম্বর, ২০১৫)। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তথা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েছে, এমনকি অফিসে বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের জন্য নথিপত্র ও ফাইলের সংখ্যাও বেড়েছে।

সরকার যদিও ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন: শ্লিপ, ইউপিইপি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটি গঠন ইত্যাদি। সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত মানউন্নয়ন সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষক- অভিভাবক সমিতির সকল সদস্য যদি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তাহলেই দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে সমাজে আলো ছড়াবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বকে চারভাগে ভাগ করা যায়: ক) বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ, যেমন: বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, পানীয় জল ও রাস্তাঘাট মেরামত, নির্মাণ ও সংস্কার, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, খ) বিদ্যালয় এলাকার পাঁচ থেকে

বার বছরের সকল ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা, গ) বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপ দেখাশুনা করা এবং ঘ) বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা।

অভিভাবক - শিক্ষক সমিতি : এই সমিতির দায়িত্বের পরিসীমা অনেক ব্যাপক। ২৭ জন সদস্য নিয়ে এই সমিতি। সদস্যদের মধ্যে এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব সমিতির সভাপতি এবং প্রধান শিক্ষক সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সমিতির দায়িত্ব হলো: বিদ্যালয় এলাকার পাঁচ থেকে বার বছরের সকল ছেলেমেয়েদের সংখ্যা জানার জন্য জরিপ করা, তাদের সকলকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে অভিভাবকদের উৎসাহিত করা, ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে ঝরে পড়া বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সুন্দর ও শিক্ষার্থীবান্ধব করতে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা করা, শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করা, উপজেলা শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা চক্র শেষে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পন্ন করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে অর্জন করার ক্ষেত্রে কমিউনিটির ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো সুশাসনের ঘাটতি। প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের অভাব শিশুদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং সুশাসনের অবস্থা নিয়ে আজ শঙ্কিত শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজন।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় পুরোটাই বেসরকারি/স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছে। সেই সময়ে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল অনেক বেশী। দেশের শিক্ষার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, টোল, মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় যাই হোক না কেন সবই গড়ে তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় জনগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, এর সকল দায়-দায়িত্ব সরকারের এই মনোভাব কমিউনিটির সকল পর্যায়ে গড়ে ওঠেছে। ফলে জনগণের সম্পৃক্ততা অনেক কমে গেছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি প্রায় ১০০ শতাংশ হলেও মাধ্যমিকে প্রায় ৪৬ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ে। (দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৮এপ্রিল, ২০১৬)। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে সকল নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তার মধ্যে মাত্র ৫৪.৮ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে। আর অন্য ছাত্রীরা ঝরে পড়ে। অন্যদিকে ভর্তি হওয়া ৬৬.২৮ শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক স্তর শেষ করে। আগের চেয়ে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগেই অনেকে ঝরে পড়ছে। এর পেছনে নানা সামাজিক কারণ ও প্রতিবন্ধকতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তো আছেই। ফলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও সব মিলিয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন এখনো সুদূরপরাহত।

প্রায় আট বছর ধরে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে এবং ভারপ্রাপ্ত হিসেবে অন্য শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছে।

আমাদের সকলের চোখে সামনে দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো আস্তে আস্তে শিক্ষাব্যবস্থার একটা অংশ হয়ে উঠেছে। এক বিশাল বাণিজ্যের উৎসে জড়িত হয়ে পড়েছে শিক্ষক, লেখক, প্রকাশকসহ অনেকে। গাইড বই, নোট বই, প্রশ্নপত্র, ব্যাগ, ব্যাজ তৈরী ইত্যাদিতে জড়িত। অনেক অভিভাবকদের মধ্যে ধারণা স্কুলে যাওয়া আসা হয় তবে পড়াশুনা হয় কোচিং সেন্টারে। তাই অভিভাবক কোচিং সেন্টারের প্রচলিত নানাবিধ পরীক্ষার জন্য শিশুদের পরীক্ষার নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার জন্য অধিক মনোযোগী।

দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগারটেন বিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কিন্ডারগারটেন এখন ব্যবসা কেন্দ্র। যা অভিভাবকদের নিকট ভীতির কারণে পরিণত হয়েছে। (আমাদের সময়.কম, ২৫ এপ্রিল, ২০১৬)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক গ্রামাঞ্চলে থাকতে চায় না। কমিউনিটি বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় গড়ে তুলে গ্রামে থেকেই অতি স্বল্প বেতনে বা বিনা বেতনে বিদ্যালয় পরিচালনা করেছে। অথচ সরকারি সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী পেয়েও তারা গ্রামাঞ্চলে থাকতে চায় না। প্রশ্ন ওঠেছে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসল শিক্ষক থাকে না। গ্রামের এসএসসি পাশ ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়িয়ে আসল শিক্ষকের নিকট থেকে এক-দেড় হাজার টাকা পেয়ে থাকেন।

জনগণ কেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে না, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে

তাদের জন্য একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে ভাবতে পারে না তা ভেবে দেখা দরকার। যদিও অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাফল্যের দৃষ্টান্ত কম নয়। দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুদের শিখণের আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে ওঠেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও প্রত্যাশিত মাত্রায় তার অগ্রগতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সরকারের গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনঅংশগ্রহণের বিষয়ে বলা থাকলেও তার বাস্তব প্রতিফলন খুবই কম। বিভিন্ন কমিটির সদস্য এমনকি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব বিষয়ে অবগত নয়। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এসএমসি, পিটিএ তেমন কার্যকর নয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা পিইডিপি-৩য় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় এবং অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এই সকল পদক্ষেপ কিভাবে কাজ করছে তা জানার জন্য দেশের সকল জনগণের বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় এবং অর্থবহ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছু কিছু পদক্ষেপ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক- শিক্ষক সমিতি তথা স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে না বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিইডিপি -৩ এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১০২১১ টি টয়লেট মেরামতের জন্য মোট ১৯৯১১৪৫০০ (উনিশ কোটি একানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা বরাদ্দ দিয়ে নোটিশ জারী করেছে (স্মারক নং ৩৮, ১৫০, ১৮০, ০২৯, ০৩,০০, ১৭৪(১).২০১৫/২০৫১, তারিখ: ১০ মে, ২০১৬, তথ্য: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইড)।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক বিদ্যালয়ের তালিকাও তৈরী করে পাঠানো হয়েছে। নোটিশে টয়লেট মেরামতে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক- শিক্ষক সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়ে কোন শব্দের ব্যবহার নেই। তবে কেন তাঁরা টয়লেট মেরামতে সহযোগিতা করবে বা টয়লেট মেরামতের পর তা দেখাশুনা করবে? সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়ের জন্য একরকম ২/৩ টা টয়লেট তার নিজেরাই করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, যদি তাঁদের অংশীদারিত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। টয়লেট মেরামত এর জন্য বিদ্যালয়ের যে তালিকা তৈরী করা হয়েছে তা প্রয়োজনভিত্তিক হয়েছে কিনা তা দেখার বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ফুলছড়ি উপজেলার পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট মেরামতের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। টয়লেট সুবিধা বেশী থাকা অবশ্যই ভাল। এ গ্রেডের পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের আগে থেকেই জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। তার একই উপজেলার বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২০১ জন। অথচ এই বিদ্যালয়ে কোন টয়লেট এবং পানির কোন ব্যবস্থা নেই। একটি ভাঙ্গা ঘরে ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাশ করে। এখানে টয়লেটের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পিইডিপি -৩ এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে টয়লেট মেরামতের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। অথচ এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট আছে। ছাত্রী ও ছাত্রদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থাও আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কমিটির অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কিছু বিষয়:

ইংরেজ শাসন আমলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধান এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর। ১৯৪৭ সালের পরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল কমিটি। ১৯৮৩ সালে বিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করার পর ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ আইন (১৯৭৪): ১৯৭৩ সালে এক জাতীয়করণ ডিক্রি বলে ৩৬,০১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। এ আইনে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি সাধন করা হয়। ১৯৭৪ সালের আইন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করে। এ আইনের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব জনগণ থেকে সরকারের ওপর ন্যস্ত করা। শিক্ষকগণ সরকারি কর্মচারীর পদমর্যাদা লাভ করেন। পরিণামে ক্রমান্বয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এককালের প্রাণপ্রিয় প্রাথমিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায়, শিক্ষার গুণগত মানে এবং দক্ষতায় ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৮১): স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম আইন হলো প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৮১)। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি প্রণীত হয়। এ আইনের অধীনে সরকার মহকুমা (বর্তমান জেলা) পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করে। এ আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থপনা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যক্রমের উন্নয়ন করা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট যথোপযুক্ত ক্ষমতা অপর্ণ করার মাধ্যমে। মূলত এই আইনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণমুখী প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সমপৃক্তকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৮৩: উপজেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫ আগষ্ট, ১৯৮৩ সালে এক প্রশাসনিক আদেশবলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করেন। এই আদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবলী ইত্যাদি। এই আদেশে জাতীয় সরকার শিক্ষার আটটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যপরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেমন: প্রাথমিক শিক্ষার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; পাঠক্রম, পাঠসূচী, পাঠ্যবই তৈরি ও উন্নয়ন; বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন ভৌতিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও একইরূপ গুণগত শিক্ষা প্রদান; শিক্ষক প্রশিক্ষণ; বিদ্যালয় তৈরির অনুমোদন; শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, বেতনসহ সকল আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং আন্তঃ উপজেলা শিক্ষক বদলি এবং উপজেলা পরিষদকে বারটি ক্ষেত্রে কার্যপরিচালনার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তার মধ্যে ছিল ১.প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিদান, বদলীকরণ এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ২.উপজেলা শিক্ষা অফিস ও বিদ্যালয়সমূহের জন্য বার্ষিক বাজেট তৈরি করে সরকারের অনুমোদন নেয়া এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। ৩.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা ও বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং সার্টিফিকেট ও বৃত্তি প্রদান। ৪.সরকার থেকে প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ উপজেলাধীন বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সরবরাহ করা। ৫.উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান, নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০): এই আইন অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত এলাকায় যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত অভিভাবকগণ তাদের শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয় অবশ্যই ভর্তি করাবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উপজেলাকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডকে শিক্ষা কর্মের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। আইনের ৪ ধারাতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। পৌরসভার জন্য অনুরূপভাবে পৌর ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি। এ আইন শিক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্ধারণ করা হয়। যেমন, ১.কমিটি নির্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষা এলাকায় প্রত্যেক শিশুর বিদ্যালয় ভর্তি ও নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিত করা। ২. প্রাথমিক শিক্ষা বয়সযোগ্য সকল শিশুর নাম, বয়স ও অভিভাবকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করা। ৩. বিদ্যালয়প্রধান প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে তার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া শিশুদের নামের তালিকা শিক্ষা কমিটি এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। ৫. কমিটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ভর্তি হয়নি এমন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও যথারীতি উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে দেশের ৬৮ টি থানায় এবং ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সমগ্র দেশে এ আইন কার্যকর করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বল্প ব্যয়ে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন (বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় স্বল্পব্যয়ে, স্থানীয় জনগণ জমি ও ১০,০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হলে অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী স্যাটেলাইট বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়), বেসরকারি উদ্যোগ স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বাড়ানোর জন্য আলোচনা শুরু হয়। বাজেট বাড়ানো অবশ্যই দরকার। তবে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধিতে কি ভূমিকা পালন করছে, প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করতে বাড়তি টাকার কি ভূমিকা তা দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সম্পদের অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আছে। সেই বিষয়টি বিবেচনা করে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া, বিনামূল্য বই দেয়া, বিস্কুট দিয়ে শিশুদের আকৃষ্ট না করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের আরও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। গ্রামের অনেক মানুষের আয় বেড়েছে যারা সন্তানদের বই কিনে দিতে পারেন।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকারিভাবে যে সহযোগিতা করা হয় তা বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের অসংখ্য সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি তথা স্থানীয় জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে কারণ এই বিদ্যালয় তাদেরই বিদ্যালয়।

মো: আব্দুল আজিজ মুন্সী

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কর্মী

শহীদুল্লাহ শরীফ

সমাপনী পরীক্ষার চাপ ও নেতিবাচক প্রভাব: শিশু ও শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

সূচনা ও ঘটনাধারা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্তে বইতে শুরু করেছিল মুক্ত বাতাস, জেগেছিল আশা; অতঃপর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আবারও মানসিক চাপে পড়ল শিশু-পরীক্ষার্থীরা। যেন বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেল এক লহমায়, মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর পুনরায় হতাশায় নিমজ্জিত হল অভাগা মা-বাবারা। মে ৩১ ২০১৬ তারিখে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এবছর থেকেই না নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ঝুলে ছিল। তিন সপ্তাহ পর ২১ জুন ২০১৬ এবছর ২০১৬ থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা মন্ত্রী জানান, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা থেকে জানানো হবে। এক সপ্তাহ পর ২৭ জুন ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে জানানো হয়, পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (সমাপনী) পরীক্ষা এ বছর চালু থাকবে।

ফলে শিশু-পরীক্ষার্থী ও তাদের হতভাগ্য বাবা-মা নিজেকে বিপদমুক্ত হয়ে যে চোখে ও মুখে স্বস্তি প্রকাশ করেছিল তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। শিক্ষার্থীরা কোচিং ছেড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন রুটিনে অধ্যায়ন ও খেলাধুলা শুরু করেছিল। এখন তারা

আবার কোচিং শুরু করেছে। যে পত্রিকাগুলো পড়াশোনা পাতায় ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিগাইড প্রকাশ বন্ধ করেছিল, তারা আবার পাতাগুলো প্রকাশ করছে।

হতভাগ্য শিশু, মা-বাবা ও দুর্ভাগা জাতির চাপা আর্তনাদ

আমি যেহেতু একজন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী-শিশুর বাবা ও শিশুশিক্ষা বিষয়ক পেশাজীবী, ফলে আমার সাথে অনেক মা-বাবা ও শিশুদের সাথে কথা হয়। শিশু-পরীক্ষার্থী ও

তাদের হতভাগ্য মা-বাবারা খুশি হয়েছিল, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক এবছর ২০১৬ থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর। আমাকে অনেকে বলেছে, আপনি ধন্যবাদ জানিয়ে একটি লেখা লিখুন, মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে। তাদের দাবিটি স্বাভাবিক, কারণ, এ বিষয়ে আমার প্রকাশিত গুণগত গবেষণা আছে, ঐ গবেষণার সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ প্রবন্ধ রূপে আমি প্রকাশ করেছি। এ উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা করেছি অনেক গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষ করে এডুকেশন ওয়াচের গবেষণা প্রতিবেদন। দেশে এবিষয়ে অসংখ্য লেখা হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনেক মানুষের সাথে এবিষয়ে কথা বলেছি। ভুক্তভোগী শিশু-পরীক্ষার্থী ও তাদের হতভাগ্য বাবা-মা এবং সংবেদনশীল কোনো মানুষই এই পর্যায়ে সমাপনী পরীক্ষার পক্ষে নয়।

বাবা-মা-অভিভাবকবৃন্দ এর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শোভাযাত্রা, র‍্যালী ইত্যাদি করেছে। তারা সংঘবদ্ধ রাজনীতিবিদদের মতো জ্বালাও পোড়াও ধরনের সংগ্রাম করেনি। কিন্তু যা করেছে তা সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্রকে তাদের দাবি জানিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। গণমাধ্যমে বিষয়গুলো যথাযোগ্যভাবে প্রচারিত ও সম্প্রচারিত হয়েছে। গণমাধ্যমকে ধন্যবাদ, তারা সংবাদ-প্রতিবেদনের বাইরেও পেশাগতভাবে, নাগরিক দায়িত্ব থেকে সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থে এ ব্যাপারে প্রচুর অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

অভিভাবক, লেখক-বুদ্ধিজীবী, গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আরও যারা আছেন সবাই যে যার ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। সবার প্রচেষ্টা ছিল মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং শিক্ষামন্ত্রী দুজনকে যুক্তি, প্রমাণাদি ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে সমস্যা সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত গঠন করা। কিন্তু কারো কোনো চেষ্টাই কাজে আসছিল না। নেতিবাচক একটি কাজ বছরের পর বছর সবাই চোখের সামনে হতে দেখে, শিশুদের পরিণাম ভেবে এবং জাতির দুঃখজনক ভবিষ্যৎ কল্পনা করে হতাশায় সিঁটিয়ে-গুটিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেও কতিপয় মা-বাবা-অভিভাবকরা তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শোভাযাত্রা, র‍্যালী ইত্যাদি চালু রেখেছে। তাঁদের জন্য আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কুফল ও নেতিবাচক পরিণাম বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ, এ বিষয়ে অনেক গুণগত মানসম্পন্ন গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে এডুকেশন ওয়াচের গবেষণা প্রতিবেদনটি উল্লেখযোগ্য। শুধু সাম্প্রতিক ক্যান্সার তুল্য সমস্যার সাথেও এর যোগসূত্র আছে বলে লেখক বিশ্লেষকগণ অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। জঙ্গী-সন্ত্রাসী সৃষ্টির পেছনেও আমাদের ভুল শিক্ষা ও পরীক্ষার চাপসহ সুস্থ আনন্দ-বিনোদনের অভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিশেষ করে ১/৭ এর গুলশান ট্রাজেডিতে জঙ্গীদের পরিচয় ও তাদের পারিবারিক বিবরণ স্পষ্ট হওয়ার পর এটা স্পষ্ট যে পরীক্ষানির্ভর শিক্ষা ও কর্পোরেট সাফল্যের উদ্দেশ্যে শেখানো শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সুস্থ, সামাজিক ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে না। যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জঙ্গী হচ্ছে, অন্যদের খবর রাখে কে? যাদের গবেষণা করার কথা, তারা তো আখের গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। আখের গোছানো সমাজে কেউ নিজ দায়িত্ব পালন করছে না। সমাজতাত্ত্বিক গবেষকরাও ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া গবেষণা যা করা হয় তার ফলাফলেও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। শিক্ষা-গবেষণা তো এদেশে সবচেয়ে অবহেলিত বিষয়। গবেষণার ফলাফল যদি সমাজে গুরুত্ব না পায়, শিক্ষা-গবেষণা যদি দেশে নিয়মিত অবিরাম চলতে না থাকে, সে সমাজ ও শিক্ষা ক্ষেত্র স্থবির হতে বাধ্য। এর মধ্যেও যা কিছু শিক্ষা গবেষণা দেশে হয় তাকেও যদি আমলে না নেওয়া হয়, তাহলে এর ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে যাবে সেটাই স্বাভাবিক।

আমি আবারও, গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ এর প্রতিবেদন "প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে? একটি নিরীক্ষা"কে গুরুত্ব দিয়ে এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস বা ফলাফলকে বিবেচনায় এনে বা আমলে নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা তাঁর বিবেক-বিবেচনা প্রসূত। আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাতে চেয়েছিলাম। তাঁর বোধোদয় ও জাতির প্রতি অঙ্গীকার আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সপ্তাহান্তে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত শৈশবেই পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষার যাঁতাকল থেকে শিশুর পরিত্রাণের আশাকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। হতাশায় বলতে হয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হবে না?

শিক্ষা বিষয়ক গবেষক, লেখক ও বিশ্লেষকগণের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং অনুসৃত নীতির কারণে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই আজ পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এ কারণে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবারই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে পড়েছে পরীক্ষার ফলাফল। ফলাফল-নিবেদিত ব্যবস্থায় পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য উল্লিখিত ত্রিপক্ষ সব সময় মরিয়া হয়ে থাকে। সবাই যেন রেসের ঘোড়া প্রথম হওয়ার জন্য টগবগ করে ছুটছে। জয়ের লক্ষ্যে সবার সম্মিলিত উগ্র চাহিদার ফলে পরীক্ষাকে ঘিরে জুয়াড়িদের আবির্ভাব হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সফল হওয়ার সহজ ও কার্যকর পন্থার সন্ধান করতে করতে স্কুলকেও পাশ কাটিয়ে পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভের দক্ষ মোক্ষম

পদ্ধতি ও ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে এই আক্কেলমন্দরা তার নৈতিক ভিত্তি না থাকুক, গড়ে উঠেছে নোট বই ব্যবসা, কোচিং সেন্টার এবং মডেল টেস্ট পদ্ধতি। মানতেই হবে, এটা বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা ব্যবস্থা। এখন উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রদের ফরজ কাজ নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ পাঠগ্রহণ নয় কোচিং সেন্টারে উপস্থিত থাকা ও অবিরত মডেল টেস্ট দিয়ে পরীক্ষার্থী হিসেবে দক্ষ ও পোক্ত হয়ে ওঠা। নকল বন্ধের জন্য নোট বই বন্ধ করার জিহাদে নেমেছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, কিন্তু ব্যবস্থার কারণে পরীক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা ও চাহিদা মেটাতে শিক্ষা-জুয়াড়িদের নোট বইসহ সব ব্যবসা বেশ জাঁকিয়েই চলছে।

যেভাবে আমরা একেবারে নিচের শ্রেণি থেকে ছাত্রদের শিক্ষার্থী সত্তার অকালমৃত্যু ঘটিয়ে তাদের পরীক্ষার্থী সত্তার বিকাশ ঘটাচ্ছি, সেটা শেষ পর্যন্ত উগ্ররূপই ধারণ করে এবং পরিণতিতে মানবিক মূল্যবোধ, সামান্য নীতিবোধেরও আকাল দেখা দেয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একে অন্যের দেখাদেখি ভীত-বিভ্রান্ত অভিভাবকেরা কোনো ঝুঁকিতে যেতে চান না। একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকেই সন্তানকে কোচিং সেন্টারের বা বাড়তি গৃহশিক্ষকের জিম্মায় দিয়ে হাঁফ ছাড়েন। পুরো স্কুলজীবনে পিএসসি-জেএসসি-এসএসসি শিশুর অবসর, বিনোদন, খেলাধুলা, বেড়ানো, সৃজনশীল কাজ, সাহিত্যপাঠ, এমনকি বাবা-মা-স্বজনদের সঙ্গে নির্মল সময় কাটানো সব কিছুই শিকেয় ওঠে। এভাবে কেবল ছাত্রের মানুষ হওয়া কঠিন হচ্ছে তা নয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং এই তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে সৃষ্ট ভাগ্যান্বেষণের সুযোগ নিতে তৎপর 'বুদ্ধিমানদের' মনুষ্যত্ব বোধ ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না।

এভাবে বেড়ে উঠা অধিকাংশ শিশু প্রায়ই কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ ডিগ্রিধারী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-উকিল-আমলা হলেও সমাজচিত্র কী বলছে? ভালো মানুষের আকাল দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না? এভাবে চললে সব প্রতিষ্ঠান, সব ব্যবস্থা ঘুনে ধরবে। চক-মিলানো রাস্তা, ভবন বাড়বে, চকচকে-ঝকঝকে মানুষ হয়তো বাড়বে, তবে দখলদারি, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, নেশা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি থামবে না।

আমাদের শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত শিক্ষার প্রতিটি স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা মেনে সেগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হলে শিক্ষার ব্যাধি -মুখস্থকরণ, নোটবই, পরীক্ষা ও ফল-কেন্দ্রিকতা কাটিয়ে ওঠা যেত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পরীক্ষা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু থাকবে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে অনুশীলনের অংশ হিসেবে। ঘন ঘন পরীক্ষার ফলে জ্ঞানানুশীলনের ধারাবাহিকতায় বাধা বা ছেদ পড়তে থাকলে শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সবাই অভ্যস্ত হয়ে যায় প্রশ্নের উত্তর-আকারে জ্ঞানের বিষয়টিকে দেখতে। জ্ঞানের বা বিষয়ের অখণ্ডতা ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা তৈরি হয় না। এ রকম ব্যবস্থায় অভ্যস্থ মানুষের পক্ষে, বড় হয়েও, কোনো পূর্ণাঙ্গ বই পড়া, জটিল ব্যাখ্যা বা দুরূহ বিষয় ধৈর্য ধরে পড়া, শোনা বা বোঝার অভ্যাস তৈরি হয় না। এতে মানুষটার সর্বনাশ হয়ে যায়। কারণ, এতে শিক্ষার যে চূড়ান্ত লক্ষ্য একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা এবং প্রকৃত স্বাধীন এবং আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তির যোগ্যতা দেওয়া, তা সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। কেবল একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের বিবেচনা ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয় এবং তাই নিজের নিজের মর্যাদার পরোয়া করেন। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়। তেমনি মানুষ প্রশ্ন ফাঁস করাকে হীন কাজ বলে বুঝতে পারেন এবং বড় কথা হলো, এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে তাঁর রুচি ও নৈতিকতায় বাধবে। ভালো মানুষ ও মানবিক সমাজ নির্মাণে উপযুক্ত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার না দিলে পুলিশ-র‍্যাব-ডিবি, সিসি ক্যামেরা-টহলদারি-নজরদারি, জঙ্গিবাদ-নেশাগ্রস্ততা-অপরাধ, রাজনীতির দেউলিয়াপনা-সংস্কৃতির সংকট-সমাজের অবক্ষয়, কর্তৃত্ববাদী শাসন ইত্যাদি কেবল বাড়তে থাকবে। তখন হয় মনে হবে প্রশ্নপত্র ফাঁস কোনো গুরুতর বিষয় নয় অথবা তা জেনেও এ উৎপাত মেনে নিতে হবে।

এটা আদতে গুরুতর বিষয়। কেননা, এতে সমাজে শিক্ষার সমস্যা-সংকট লেগেই থাকবে, তেমনি থাকবে জাতির চরিত্র গঠনের সমস্যা। প্রশ্ন হলো যে কথাটা আমরা জানি এবং মানি, যে কারণে ক্ষমতায় এসে সরকার শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল, তিন মাসে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সে বছর থেকেই তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল, তাকে কেন উপেক্ষা করা হচ্ছে? আমরা জানি না, অর্থের অভাবে না অন্য কোনো কারণে সরকার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে হাত দিচ্ছে না। তবে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৩ শতাংশের নিচে বরাদ্দ রেখে সংখ্যাগত উন্নতি সম্ভব হলেও গুণগত মান অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য অন্তত আন্তর্জাতিক মান ৬ শতাংশ বিনিয়োগ প্রয়োজন। বর্তমান পরীক্ষার ফলের পেছনে ছুটে সংখ্যাগত সাফল্য আসবে, কিন্তু গুণগত মান অর্জন ঠেকে থাকবে। এ বাস্তবতায় যে একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ঠেকানো যাবে না এবং অন্যদিকে সমস্যার জবাব দিয়ে গুণগত মান অর্জনের অভীষ্ট পথে চলা সম্ভব নয়, তা বুঝে শিক্ষামন্ত্রীকে বারবার হয় অসহায়ত্ব নয়তো হতাশা প্রকাশ করতে হবে। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

শিক্ষায় আমাদের অর্জন সংখ্যাগত কিছু তথ্য-ডাটা, বাদবাকি সবই বিসর্জন। সমাপনী পরীক্ষার চাপে শিশুর শৈশবের বিলুপ্তি, পরিণামে সমাজে নেতিবাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব। বিষয়টি প্রধান ভুক্তভোগী শিশুরাও বোঝে, হতভাগ্য মা-বাবারাও সোচ্চার, সমাজের-রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কিত। কিন্তু কারো কোনো উদ্বেগজাত নৈতিক উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রচেষ্টাই কাজে আসছে না, সকলের বিলাপ মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তে অপলাপ হয়ে গেল। তাই দুর্ভাগা জাতি স্তম্ভিত হয়ে বিষাদগ্রস্ত মানুষের মতো নীরবে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি আমার এ লেখাটি যা বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ক গবেষক, লেখক ও বিশ্লেষকগণের মত, বক্তব্য ও দাবিকে ধারণ করে প্রকাশিত হল তাও কোনো কাজে আসবে না জানি। তবুও এ অরণ্যে রোদন। বুকটা হালকা করা বৈকি!

সমাপনী পরীক্ষার চাপে শিশুর শৈশবের বিলুপ্তি, পরিণামে সমাজে নেতিবাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব। বিষয়টি প্রধান ভুক্তভোগী শিশুরাও বোঝে, হতভাগ্য মা-বাবারাও সোচ্চার, সমাজের-রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কিত। কিন্তু কারো কোনো উদ্বেগজাত নৈতিক উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রচেষ্টাই কাজে আসছে না, সকলের বিলাপ মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তে অপলাপ হয়ে গেল।

শিশু ও শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

আমাদের শিশুবান্ধব ও শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তানদের সুস্থ বিকাশ ও সাম্প্রতিক শিক্ষার্থীদের কতিপয় বখে যাওয়া তরুণদের নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে তাদের সুরক্ষায় বাবা-মা ও অন্য অভিভাবকদের প্রতি নিজ নিজ সন্তানদের জন্য আলাদা সময় বের করার জন্য বাবা-মায়ের প্রতি আহ্বান জানান। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্তানেরা কী করে, কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, এসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব; যাতে তারা কোনো ভুল পথে পা না বাড়ায়।' স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানদের একাংশ, যাদের পরিবার তাদের কোনো অভাব-অভিযোগ অপূর্ণ রাখেনি, তারাই ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেখা যাচ্ছে, তাদের কোনো একটা চাওয়া-পাওয়ার অপূর্ণতাও তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে।'

সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি তাদের জন্য পিতা-মাতাকে আলাদা সময় বের করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা সন্তানের সব ভালো-মন্দের দিকে নজর রাখবেন। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় যেন তারা শিক্ষিত হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করবেন।'

আমাদের কথা হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেশগুলো পালনের সাথে মা-বাবা, অভিভাবকের সাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান পরীক্ষানির্ভর ও মুখস্থকরণকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের জীবনে সময়ের বড় অভাব আনন্দ-বিনোদন খেলাধুলা, কথা বলারও সময় নেই, সেখানে তাঁর সুপরামর্শগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব। এজন্যই পরীক্ষানির্ভর ও মুখস্থকরণকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গলদগুলো সারতে হবে। প্রথমেই বন্ধ করা দরকার সমাপনী পরীক্ষার চাপ, যার প্রভাবে অনেক নিচের ক্লাস থেকেই শিশুদের উপর চেপে বসেছে পরীক্ষানির্ভর ও মুখস্থকরণকেন্দ্রিক শিক্ষা। আমরা অভিভাবক, শিক্ষা বিষয়ক গবেষক, লেখক ও বিশ্লেষক, গণমাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিবর্গসহ সবাই জাতির পক্ষ থেকে দাবি করছি, আমাদের শিশুবান্ধব ও শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ নেবেন। তিনি নিশ্চয় জাতিকে পরীক্ষানির্ভর ও মুখস্থকরণকেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে রক্ষা নিমিত্তে প্রথম উদ্যোগ হিসেবে সমাপনী পরীক্ষা বন্ধের ব্যবস্থা নেবেন। ধাপে ধাপে তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমস্যাগুলো দূর হবে এই আশা আমরা করতেই পারি। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা ছাড়া যাবতীয় উন্নয়ন ও উন্নতি পরিণামে সফলতা পায় না, যা সারাদেশের মানুষও ভালোভাবে বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু ব্যবস্থা ও নীতিগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, সেহেতু রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বেই এখানে সংস্কার আনতে হবে। তাই আমাদের শিশুবান্ধব ও শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এব্যাপারে একটি ইতিবাচক ভূমিকা আশু প্রয়োজন। সবার আগে চাই এবছর ২০১৬ থেকেই পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমরা বারবার হতাশ হয়েও পুনরায় আশার আলোকবর্তিকা আমাদের শিশুবান্ধব ও শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় আশাবাদী হয়ে উঠি। এবারও তাঁর সহায়তায় জাতি মুক্ত হবে ইনশা-আল্লাহ।

শহীদুল্লাহ শরীফ
শিক্ষা-গবেষক ও লেখক, বিআইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

সার্বিক প্রতিরোধ গড়ার এখনই সময়

পরিবার ও সমাজ থেকে স্বেচ্ছায় অথবা কারো প্রভাবে পড়ে বিচ্ছিন্ন, আমাদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী তরুণরা গুলশানে ও ঈদের দিনে শোলাকিয়ায় যে তান্ডব সৃষ্টি করেছে তার একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আছে। একসময় ধারণা করা হত যে, মাদ্রাসায় পড়ুয়া দরিদ্র ছাত্ররা মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে জঙ্গী হয়। কিন্তু সর্বশেষ ঘটনাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এ মূল্যায়ন ছিল অতি সরলীকৃত। এখন হতদরিদ্র পরিবারের উঠতি তরুণ ও বিত্তশালী পিতামাতার সন্তান উভয়কেই জঙ্গীর কাতারে সামিল হতে দেখা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত যারা জঙ্গীর খাতায় নাম লিখিয়েছে তারা তরুণ শিক্ষার্থী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা মাদ্রাসার। পরে হয়তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বেসরকারি কলেজের ছাত্রের নামও তালিকায় আসবে।

একটি দৈনিক পত্রিকা তিন ছাত্রীর সুইসাইড স্কোয়াডে যোগ দেয়ার যে খবর ছেপেছে তা সত্য হলে সংকটে নতুন মাত্রা যোগ হবে। প্রশ্ন হলো ছাত্র হোক ছাত্রী হোক, বিপথগামী আমাদের এসব সন্তানদের সঠিক পথে আনতে গেলে কি করা দরকার।

নানা উপাদান-উপকরণের বৈচিত্র্য থাকলেও সংকটের চরিত্র জাতীয়। কাজেই এর প্রতিরোধও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করতে হবে। উগ্রতার উর্ধে উঠে সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি, প্রকৃত ধর্ম বিশেষজ্ঞ, নীতি প্রণেতা সকলেরই ভুমিকা পালন করা অপরিহার্য।

কিন্তু একথা বলা যতটা সহজ করা আদৌ সহজ, নয়। ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা, স্বার্থ-উদ্ধারের চিন্তা, আড়ষ্টতা, সত্য উচ্চারণে সাহসের অভাবসহ নানা জটিলতা তো আছেই। তারপরও সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের সকলেরই অবস্থান স্পষ্ট করা দরকার বলে মনে করি। জাতীয় পরিসরে ক্ষমতার জন্য রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একাধিপত্য বহাল রাখতে সংকীর্ণতাবাদ, মৌলবাদ ও যুদ্ধকে উস্কে দেবার মতো প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কার্যক্রম বিশেষভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখে।

জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার বাইরে অবস্থানরত ও ক্ষমতায় যেতে অধীর রাজনৈতিক দল ও শক্তি বলয় সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটা ধারণা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরাশক্তি কখন যে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে

দেখেও দেখে না, কখন যে তাকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়, তা বলা কঠিন। তালেবান, আইএস এর প্রাদুর্ভাব ও তা প্রতিরোধের নামে পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিদের ভূমিকা তাই অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকে।

দেশে হঠাৎ করেই যেন চলতি বছরে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি হামলা বেড়ে গেছে। পুরোহিত, সেবায়েত, শিক্ষক বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির ওপর হামলার পর রাজধানীর গুলশান-২ এর ৭৯ নম্বর রোডের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে ২২ জনকে। যাদের মধ্যে ১৭ জনই ছিলেন বিদেশি নাগরিক। এর পরের ঘটনাটি ঘটেছে শোলাকিয়ায়। প্রশাসনের সময়োচিত হস্তক্ষেপ না হলে বিশেষ করে আগে থেকে সতর্কতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা না হলে প্রাণহানির ঘটনা যে অনেক বেশি হতো তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিদেশীদের উপর হামলা কেন? আমাদের পোষাক শিল্প উন্নয়ন ও ঢাকা মেট্রো রেল স্থাপনের সাথে যুক্ত বিদেশীদের আক্রমণ দেশ-বিদেশের কার স্বার্থে? একই সাথে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের বিপথগামী সন্ত্রাসী ও নিখোঁজ তরুণদের সংখ্যা কত হতে পারে? কারো মতে নিখোঁজদের সংখ্যা ১০। কেউ বলছেন ৩০। সর্বশেষ স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, তাদের কাছে ১ হাজার নিখোঁজ তরুণের তালিকা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম সহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পশ্চিমা দেশগুলোতেও বর্তমানে সন্ত্রাসী হামলা ও প্রাণহানির ঘটনা বেড়েছে। বাংলাদেশে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে যে সন্ত্রাসী ঘটনার শুরু, পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশ্যে ও ছদ্মাবরণে সামরিক শাসনামলে তার বিস্তার ঘটেছে অব্যাহতভাবে। গত দেড় দুই দশকে তাতে নতুন মাত্রা ও উপাদান যুক্ত হয়েছে।

গুলশান ও শোলাকিয়ার সর্বশেষ দুটি ঘটনা ছিল আক্ষরিক অর্থেই নৃশংস এবং ভয়াবহ। সন্ত্রাসী ঘটনার ধরণ, অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় এসব ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কাজ। কিন্তু পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করছে ও মতামত ছাপাচ্ছে তাতে সন্ত্রাসের মূল কারণ ধর্মীয় উগ্রবাদকে আড়াল করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সন্ত্রাস মোকাবেলা নয়, তাদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী মূল ইস্যু ভিন্ন। জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ফরেন সার্ভিসের সহযোগী সম্পাদক ক্রিস্টিন ফেয়ার ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ যে সংকট মৌলিকভাবে মোকাবিলা করছে সেটা হলো, তাদের জাতি বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই ধরনের ভাষ্য আছে। আর সেটাই স্পষ্ট করে যে, দেশটি দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। বিএনপি অনেকটাই মধ্য ডান, যারা বিশ্বাস করে যে, রাজনীতিতে ইসলামের একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাকে খাটো করে দেখে। ... বাংলাদেশে জামায়াতের প্রতি সমর্থন সত্যিই অনেক বেশি। সুতরাং সেই অবস্থায় শেখ হাসিনা যখন এরকম একটি দলকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে চান, তখন বোঝা যায় যে, তিনি হয়তো বাস্তবতা থেকে কিছুটা দূরেই আছেন। আর এটা তো একটা অসম্ভব যুক্তি যে, জামায়াতের সব নেতাকর্মী সন্ত্রাস বা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত আছেন।'

বিদেশি এ অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করছেন যে, আমাদের দেশের সন্ত্রাসকে অভ্যন্তরীণ ক্রোধ ও হতাশা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাহলে সন্ত্রাস প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্যমতের অবকাশ কতটুকু আছে? বিবাদমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কি জাতীয় স্বার্থে জাতীয় প্রয়োজনে ক্ষমতার রাজনীতির উর্ধে উঠতে পারবেন? এক পক্ষ কি নিজের দলীয় অবস্থান থেকে সরে গিয়ে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে অবস্থান নেয়ার সক্ষমতা রাখেন? এ প্রশ্ন মিলিয়ন/বিলিয়ন ডলারের।

উল্লেখ্য, সরকারবিরোধী বিএনপি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে ক'দিন বাদেই অবস্থান পরিবর্তন করে সরকারকে জঙ্গী দমনে ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে তাদের পছন্দসই নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়। এর আগে ক্ষমতাসীন দল ও জোট থেকে বিএনপির সন্ত্রাস প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী, সন্ত্রাসের উৎস জামাতকে ছেড়ে সন্ত্রাস বিরোধী জাতীয় কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার আহবান জানায়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটি বড় অংশ মনে করেন, বিএনপির অবস্থান এবং উপরে উল্লিখিত ক্রিস্টিন ফেয়ারের অভিমতের মধ্যে একটা মিল আছে। তার পরও মাঝেমধ্যে আশার আলোর ঝলক লক্ষ করা যায়। বিএনপির নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ বলেছেন, সন্ত্রাস প্রতিরোধে বিএনপিকে বাদ দিয়ে ঐক্য হতে পারে না। তবে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে।

ষাটের দশকের শেষভাগে ঢাকার রায়েরবাজার স্কুলে বন্ধুবর মাসুদুল হকের সরাসরি ছাত্র, আবার ছাত্রতুল্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান দুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন ...'সন্ত্রাস দমনে সরকারের চরম ব্যর্থতায় পদত্যাগ দাবি না করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়ালে বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা আরও বেশি বাড়ত বলে অনেকেই

মনে করেন। আমরা প্রায়ই বলে থাকি, শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমরা রাজনীতি করি না। প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী-এমপি হওয়াও মূল উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই, জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। তাই যদি হয় তাহলে যেখানে সরকারের ব্যর্থতার জন্য জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত সেখানে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকারের পাশে দাড়ানোই অনেক বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করত। ... পুত্রহারা মায়ের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নাটকীয়ভাবে ছুটে গিয়েছিলেন, ম্যাডামও কিন্তু একইভাবে শুক্রবার গুলশান হামলার পরে শনিবার ২ জুলাই দুপুর বেলা গণভবনে ছুটে গিয়ে সরকারকে হতভম্ব করে দিতে পারতেন। শুরু করতে পারতেন দেশে রাজনীতির এক নতুন পথযাত্রা... । '

প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত, সাহসী, দ্রুত ও সঠিক দিকনির্দেশনা, আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং বীরোচিত সাহস গুলশান ও শোলাকিয়ার সন্ত্রাসী ঘটনার সফল সমাপ্তি ঘটিয়েছে। সন্ত্রাস মোকাবেলায় সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, পুরো জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাদের স্মরণ করছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা অব্যাহত থাকবে।

সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ থেকে তরুণ শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে শিক্ষামন্ত্রী ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন কোনো শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। নীতিগত দিক বিবেচনায় তাঁর নির্দেশ যথার্থ। কিন্তু ৩০/৩৫ হাজার প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো তালিকা যাচাই করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়াটা সহজ কাজ নয়। সেজন্য অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি তদারকি সেল গঠন করা দরকার। সে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনোবিজ্ঞানী/কাউন্সেলর নিয়োগের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। আসলে শিক্ষার্থীর লেখাপড়া থেকে শুরু করে তাকে সঠিক পথে পরিচালনায় মা-বাবা ও শিক্ষকের মাথাব্যথাই সবচেয়ে বেশি এবং তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনই সবচেয়ে বেশি দরকার।

আমাদের ছেলেদের একটি অংশের বিপথগামী হওয়ার নানা কারণ এখন বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানীরা তুলে ধরছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় নানা অসঙ্গতির সাথে সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের পরিচর্যা ও যত্নাভাব, তার সাথে স্নেহের বন্ধন ও নৈকট্যের ব্যবধান, ধর্মচর্চায় অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও যথোপযুক্তভাবে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দানে ব্যর্থতা, ইন্টারনেটের অবাধ প্রভাব ও উত্তেজক প্রচারণার ক্ষেত্রে মনিটরিং-এর অনুপস্থিতি, শিক্ষার্থীর সামনে অভিভাবক ও শিক্ষকের দিক থেকে আদর্শ ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষমতা, সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রযোজ্য সকল সামাজিক স্তর ও পরিধিতে সাংস্কৃতিক কর্ম কান্ডের অনুপস্থিতি নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। কিছু নৈতিক হিতোপদেশ দিয়ে সকলেই দায় সারা দায়িত্ব পালন করি।

জঙ্গিবাদের বিপদকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া এবং এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অনুপস্থিতি যে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরির জন্য দায়ী আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এবং আমাদের শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও তার মূল্যায়ন করেন বলে মনে করার কারণ নেই। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা ও বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণও একই সাথে এর জন্য দায়ী।

সুহার্তো-পূর্ববর্তী ইন্দিনেশিয়ায় বামপন্থী নেতা ডি এন আইদিতের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় : 'সক্রিয়তা তারুণ্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তাকে সৃষ্টি করতে না দিলে, তার জন্য সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে সে ধ্বংস করবে।' তরুণ সমাজকে কাজে লাগাতে না পারার যে ব্যর্থতা, তার দায়ভার আমাদের সকলের উপরই বর্তায়।

আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেনডের কথা বলি ও শুনি। একটি প্রজন্মের সময় কালে যা এক বারই আসে। তারুণ্য-যৌবনের সক্ষমতার সদ্ব্যব্যবহার, তার কর্মক্ষমতাকে সৃষ্টিশীলতায় রূপান্তরে ব্যর্থতা অমার্জনীয়। সব কিছু নিয়ে দলচর্চা না করে, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডুকতার টোপ ও বৃত্ত থেকে বের হয়ে সৃজনধর্মিতা ও মুক্তিবুদ্ধি চর্চাকে আশ্রয় করে আমাদেরকে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

ভারতে ইতোমধ্যে ইমাম ও ইসলাম ধর্মবিশারদেরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেটে জঙ্গিবাদে জড়িত না হতে মুসলিম তরুণদের প্রতি আহবান রাখা শুরু করেছেন। আমাদের দেশে যে সংকট ইতিমধ্যে ঘনীভূত হয়েছে তার জন্য দোষারোপের প্রবণতা পরিহার করে যে যার অবস্থান থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম, আমাদের সন্তানদের সুরক্ষায়, তাদের কাঙ্ক্ষিত বিকাশে এগিয়ে আসার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। শিক্ষক, অভিভাবক, সংস্কৃতিসেবী, কর্মকর্তা, নেতা-জনতা সকলের ভূমিকা তথা সার্বিক জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার এখনই সময়।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য
প্রধান সমন্বয়কারী, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট

(পুনমুদ্রিত)

দিল মনোয়ারা মনু

মুক্তিযুদ্ধে এক লড়াকু সৈনিক শিরিন বানু মিতিল

শিরিন বানু মিতিল একটি সাহসের নাম- যিনি প্রথা, প্রতিরোধ ভেঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দু:সাহসী ভূমিকা রেখে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই সেই অকুতোভয় একমাত্র নারী যিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে পুরুষের পোষাক পরে অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন।

শিরিন বানু মিতিল একটি রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোয় আলোকিত ছিল তার পূর্ববর্তী দুই প্রজন্ম। নানা খান বাহাদুর ওয়াসী মুদ্দিনা আহমেদ ছিলেন পাবনার প্রথিতযশা আইনজীবী, সমাজসেবী এবং পাবনা পৌরসভার প্রথম সভাপতি এবং জেলা বোর্ডের আজীবন সভাপতি।

কথিত আছে গরীব প্রজাদের মামলা বিনে পয়সায় করে তৎকালীন জোতদার জমিদারদের রোষানলে পরেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই আপস করেন নি। যার জন্য সেই সময় তার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিলো ১০ হাজার টাকা।

সেই পরিবারেরই মেয়ে শিরিন বানু মিতিলের মা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ সেলিনা বানু। রাজনীতি আচ্ছাদিত পরিবার বলে তা ছিলো পুরোপুরি কু-সংস্কারমুক্ত। শিক্ষার আলোয় আলোকিত। জানা যায় সেলিনা বানুর এক ভাইও সেই সময়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেলিনা বানু রাজনীতিতে আসেন ১৯৩৯-এ অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে। এছাড়া পিতার প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল রাজনীতির ধারা তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। তাই তিনি তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পাবনার নানামুখী সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শিরিনকে এবং তার ধারাবাহিক কাজকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে তার পরিবারে এই মানুষগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানা দরকার। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের সময়ে সেলিনা বানু মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির লঙ্গরখানায় স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নন্দিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি পাবনা জেলা ছাত্র ফেডারেশন সভাপতি হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সাথী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য খন্দকার শাহজাহান মোহাম্মদ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হয় যুক্ত ফ্রন্টের সময়ে তাদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সেলিনা বানু এমএলএও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এভাবেই মা বাবার বিরল আত্মত্যাগ ও আদর্শের পথরেখা ধরেই শিরিনের কর্মজীবনে প্রবেশ এবং ক্রমান্বয়ে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠা। এখানে উল্লেখ করা দরকার মাত্র তিন বছর বয়সে শিরিন মায়ের সাথে কারাবন্দী ছিলেন। জীবনযুদ্ধে অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী এই মানুষটির জীবনের লড়াই ছিল সমাজের হাজার বছরের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। উদার প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক পরিবারে জন্ম বলেই মানুষ হবার শিক্ষাটা পেয়েছিলেন পরিবার থেকে, জীবনের শুরুতেই। কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছাকেই প্রধান্য দিয়েছেন- তাই সারা জীবন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে

লড়াই করার ইচ্ছায় প্রিপট্রাষ্টের একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন। যুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, নারী প্রগতি সংঘ এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সাথেও। এর পেছনে তার সক্রিয় রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে আমার মনে হয়। তার এই চলে যাওয়া এদেশের সুবিধা বঞ্চিত নির্যাতিত অনেক নারীর জন্যই প্রচন্ড হাহাকার, অশেষ শূণ্যতা যা সহজে পূরণ হবার নয়।

'৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাবনায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রবেশ করে কারফিউ জারী করে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার শুরু করে। ২৭ মার্চ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়, এই যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে জনযুদ্ধে পরিণত হয়। ঘরে ঘরে মেয়েরাও এই প্রতিরোধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে উত্তাল রণক্ষেত্র শিরিনকেও অস্থির করে তোলে। ভাই জিঞ্জির তখন বলেছিলো, বুবু তুমি কি প্রীতিলতার মত পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করতে পারোনা। এই কথাটিই শিরিনকে উদ্বুদ্ধ করে। ২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দখলরত ৩৬ জন পাকসেনার সাথে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ হয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পুলিশ লাইনেও। সেই যুদ্ধে শিরিনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধে ৩৬ জন পাক সেনা এবং ২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। সর্বত্র শুরু হয় খন্ড খন্ড যুদ্ধ। মত্র ৩০ মিনিট অস্ত্র চালনা শিখে এই যুদ্ধ করেন তিনি। ৩০ মার্চ পাবনা স্বাধীন হয়। ৩১ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সার্বক্ষণিক কাজের সমন্বয়ের জন্য এই পরিষদের একটি কোর কমিটিও গঠন করা হয়। যার দায়িত্বে ছিলেন পাবনা ন্যাপের সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাদশা। তিনিই জেলা প্রশাসককে শিরিনের ছেলের বেশে যুদ্ধ করার কথা জানিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকায় শিরিনের ছবিসহ সাক্ষাৎকার ছাপা হলে শিরিনের ছেলে সেজে যুদ্ধ করার সুযোগটি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদের সাথে শিরিনকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় ক্যাম্পে। শিরিনকে আশ্রয় দেন নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্র। এখানেই নারীদের নিয়ে একটি ক্যাম্প গঠন করা হয়। সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬-এ। সেই থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরী। এক সময় এই ক্যাম্পের নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫০০ তে উত্তীর্ণ হয় কিন্তু অস্ত্রের অভাব থাকায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই নারীদের হাতে তখন অস্ত্র তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে শিরিন বানুরা মুক্ত দেশে ফিরে আসেন।

এখানেই শেষ হয় '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অদম্য সাহসী নারী যোদ্ধার কথা- অত্যন্ত দু:খের সাথে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কর্মচঞ্চল এই মহান মানুষটির জীবন থেকে বিদায় নেয়ার কথাটাও বলতে হল।

শিরিন আমার ভালো বন্ধু। আমরা একসাথে দীর্ঘদিন কচিকাঁচার মেলা করেছি সেই সূত্রে বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর হয়েছে। শিরিনের সংগ্রামী মা বাবাও শুরু থেকে কচিকাঁচার মেলার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাই শিরিনদের পরিবার কচিকাঁচা পরিবারের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাদের সকলের অপার শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত।

অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার লড়াইয়ের অসীম সাহসী এই বীর নারীকে আজ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। সারাজীবন দেশকে ভালবেসে দেশের জয়গান গেয়েছেন, জীবনকে উৎসর্গ করার সাহস দেখিয়েছেন। তাই শিরিন আমাদের গর্ব- আমাদের অহংকার। তার বন্ধু হিসেবে আমি ধন্য।

দিল মনোয়ারা মনু

সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী

(লেখাটি পূনমুদ্রিত, ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে *দৈনিক কালের কণ্ঠ*-এ প্রকাশিত হয়েছে)

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

শিক্ষা বিষয়ে ২ শিক্ষকের ৩ গ্রন্থ

অন্যান্য অনেক বিষয়ে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত বইয়ের প্রকাশনা তেমন একটা চোখে পড়ে না। সমাজতাত্ত্বিক বিবিধ আলোচনার মধ্যে শিক্ষার মত বিষয়ের অনুপ্রবেশ দেখা যায় যদিবা, তবে সেগুলিতে শিক্ষা বা শিক্ষাসমস্যা নিয়ে যেসব মন্তব্য পাওয়া যায়, তা বিক্ষিপ্ত। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা, শিক্ষাদানের সমস্যা, ক্লাস রুটিনের মত জটিল বিষয়, বিনিয়োগ অনুযায়ী দেশে মানসম্মত শিক্ষা এখনও দুর্লভ, এ ধরনের নির্দিষ্ট বিষয়ে তিনটি বই আমার হাতে এসেছে। আশা করি, আরো কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, শিক্ষা বিষয়ক বইয়ের ক্রেতা বা ভোক্তার সংখ্যা সীমিত। বোধ করি, কিছু সরকারি সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থার আনুকূল্যে শিক্ষা বিষয়ক বইয়ের যৎসামান্য চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।

যে দু'জন লেখকের তিনটি গ্রন্থের সমীক্ষা নিচে পরিবেশন করা হবে, তাঁরা দু'জনই অভিজ্ঞ শিক্ষক, শুধু তাই নয়, বাস্তব পরিচয়ে তাঁরা শিক্ষকের শিক্ষক অর্থাৎ তাঁরা দু'জনেই ঢাকা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দান কাজের সাথে জড়িত আছেন। বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রণীত ও প্রকাশিত কিছু বইয়ে তাঁদের নাম দেখেছি বলে মনে হয়। পাঠদান এবং নানা রকমের শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার পরেও যে এই দুই জন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে রচিত তাদের স্বল্পপরিসর শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলি একত্রে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেজন্য প্রথমেই তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

সাক্ষরতা বুলেটিন প্রকাশনার পৃষ্ঠাসংখ্যা সীমিত ও একান্তই সুনির্দিষ্ট, সেকথা মনে রেখেই এই গ্রন্থালোচনাকে বিচার করতে হবে, এবং তা গণসাক্ষরতা অভিযান-এর এই মাসিক প্রকাশনার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে, যেসব বিষয় এই গ্রন্থটির আলোচ্য, সেসব নিয়ে এই পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তির পর্যালোচনা বিভিন্ন বিরতিতে আমাদের চোখে পড়ে। লেখকরা যেমন এই তিনটি বই থেকে তাদের বিভিন্ন মতামতের সপক্ষে বেশ ভালোরকমের সায় পাবেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে ভিন্নমত প্রদান করার সুযোগও পাবেন।

Education Watch গোষ্ঠীর সাম্বাৎসরিক যে গবেষণা প্রকাশিত হয়, তার ভিত্তিতে নতুন আলোচনার সূচনাও হতে পারে। তিনটির মধ্যে একটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট একটা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়টি হল: মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের ক্লাশ রুটিন। খুবই তাৎপর্যবহ একটি বিষয়। যাঁরা বইটা রচনা করেছেন, বলা উচিত এমন এক কর্মগবেষণায় নিয়োজিত হয়েছে, এই বিষয়ে তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে তাদের পর্যালোচনা ও অভিমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দাবি করে।

ক্লাশ রুটিন বিষয়ে যে ব্যাপক ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দু'জন শিক্ষক যাঁরা শিক্ষণ ও শিখন বিষয়ে পরিকল্পনা ও পরিবেশনার কাজে পেশাগতভাবে ব্যাপৃত, তাঁরা যে মতামত প্রদান করেন তা অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষকদ্বয় শুধু যে তাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করবেন, এমনটা ভাবতে চাই না। আশা করি, তারা দেশের বাস্তব অবস্থাও জানেন এবং তাদের মতামতের একটা পরিপ্রেক্ষিতগত দৃঢ় ভিত্তি আছে। তাদের লেখা ভূমিকা থেকেই জানা যায়, যেসব সুপারিশ তারা পেশ করেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার কিছু কিছু অংশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছেন। এটি যেমন তাদের কর্মগবেষণার মূল্যকে নির্দেশ করে, তেমনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দেয়।

অন্য বই দু'টি এই শিক্ষকদ্বয়ের শিক্ষাভাবনা আমাদের কাছে আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে। এঁরা দু'জনই যেমন শিক্ষণের বাস্তব প্রয়োগরীতি নিয়ে কাজ করেন, তেমনি সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার, বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার বাস্তব অবস্থা, বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ এবং সম্ভাব্য সমাধান, অংশগ্রহণমূলক শিখন-শিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

Inside Education • লেখক: রণজিৎ পোদ্দার
প্রকাশক: সুলেখা প্রকাশনী • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৮৪ • দাম ৩২০ টাকা

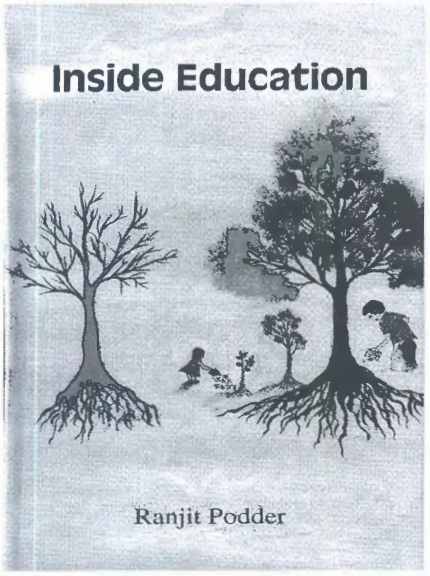

রণজিৎ পোদ্দার ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তার বইয়ের প্রচ্ছদটি বেশ আকর্ষণীয়। তা দেখে এটা যে শিক্ষা বিষয়ক একটি গ্রন্থ তা বুঝতে বেশ একটু কসরৎ লাগে। এই প্রচ্ছদ কৃষি বা পরিবেশ বিষয়ক কোন প্রকাশনার জন্য অধিক মানানসই মনে হয়। এমনকি এটা গভীর অনুভূতিপ্রবণ কোন কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদও হতে পারতো। অনিসন্ধিৎসু হয়ে প্রচ্ছদশিল্পীর পরিচয় জানতে গিয়ে দেখলাম অথবা বুঝলাম আঁকিয়েরা গ্রন্থকারের সন্তান। এটা থেকে গ্রন্থকারের গভীর বাৎসল্যভাবের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়। এবার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

মোট ৩৭টি স্বল্পায়তনের নিবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। যদিও তার নিজের মুখবন্ধে অধ্যাপক পোদ্দার এই সংখ্যা ৩৬ বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক তার মুখবন্ধে দাবি করছেন এই বই থেকে সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবেন পাঠকরা এবং নীতিনির্ধারণী মহল বইটির বিষয়বস্তুকে মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারেন।

কিন্তু বিভিন্ন বিরতিতে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহকে তিনি একটি গ্রন্থের দুই প্রচ্ছদের মধ্যে সংকলন করার সময় লেখাগুলির বিন্যাস নিয়ে কিছু বলেননি। তিনি বিষয়ের দিক থেকে গুচ্ছ আকারে সেগুলি পরিবেশন করতে পারতেন। মনে হল, তিনি হয়ত প্রকাশের সময়ক্রম মান্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেখলাম তাও নয়, সেখানেও ব্যাপারটা তারিখওয়ারি নয়। রচনাগুলিকে তিনি নির্বাচন করেছেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু তারও সাংগঠনিক কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আর একটা বিষয় সাধারণ পাঠককে চমৎকৃত করবে। একই নিবন্ধ দুই বা ততোধিক সংবাদপত্রে এর আগে ছাপা হয়েছে। এমনটি আগে কোথাও দেখিনি।

প্রথম প্রবন্ধটিতেই একটি একাডেমিক জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের নামটি কি যথোপযুক্ত? এই প্রতিষ্ঠান যেসব কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তাতে এটাকে 'শিক্ষা ও গবেষণা কলেজ' হিসেবে নামকরণ করা উচিত। বড় কোন বিতর্ক নয়, তবে লেখকদ্বয়ের বক্তব্য গভীর বিবেচনা দাবি করে। পরের লেখাটাই আবার বেশ বৈষয়িক- এই কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি এটির আলোচ্য বিষয়। মোট ৩৭টি প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটিতে একই বিষয় স্থান পেয়েছে। কিন্তু বৈচিত্র্যই এই গ্রন্থের সম্পদ। এর মধ্যে আছে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি, মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান; শিক্ষার্থীদের শাস্তি; ইংরেজি বিষয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম নিয়ে পর্যালোচনা আছে। একটি রচনার শিরোনাম, মাধ্যমিক শিক্ষা বাঁচাও (Save Secondary Education)। ওই রচনায় অধ্যাপক পোদ্দার আমাদের জানাচ্ছেন যে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ বেরিয়েছে,- অন্তত একশত জন শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা বা কোচিং সেন্টার পরিচালনার মাধ্যমে কোটিপতি হয়ে গেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, স্কুলের শ্রেণিকক্ষের পাঠদানে বেশ অবক্ষয় ঘটে গেছে। বহু শিক্ষক (শিক্ষকদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলছি) আলাদা করে ব্যাচ বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাকে পণ্যের মত সরবরাহ করতে যতটা ব্যস্ত, স্কুলে শিক্ষাদানের বিষয়ে তার সিকিভাগও আন্তরিক নন। অধ্যাপক পোদ্দার সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট বিরতিতে বদলির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন বড় ও গভীর ব্যাধির জন্য এমন টোটকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আর বেসরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কি করা হবে? তারাও তো গৃহশিক্ষকতা করেন বা কোচিং কেন্দ্র চালান এবং সংখ্যায় তো তারা অনেক বেশি।

কোন কোন লক্ষণের দ্বারা ভালো বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করবো, এমন বিষয়ে নিখেছেন রণজিৎ পোদ্দার। এমন প্রশ্ন তুলতে গিয়ে ওই নিবন্ধে তিনি আরও অনেক উপাদানকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং মূল্যবোধ সংযোজন (value addition) করে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আখ্যা প্রদান করার সুপারিশ করেছেন। যোগাযোগমূলক ভাষা শিক্ষা নিয়ে সমাজে একটা বিতর্ক আছে। অধ্যাপক পোদ্দার তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অনেক বিষয়েই প্রশ্ন আছে: স্কুলে ৫০ মিনিটের ক্লাস কি যথেষ্ট বা গ্রেডযুক্ত শিক্ষা ভালো না মানসম্মত শিক্ষা? Pedagogy and Andragogy: What and Why? এমন সব জটিল বিষয়ও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক পোদ্দার বিভিন্ন বিষয়ের যে পর্যালোচনা করেছেন ও অভিমত প্রদান করেছেন, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার ক্ষেত্র খুবই সীমিত। হয়ত আরো বিশদ ব্যাখ্যা করা যায়। তবে সেই তর্কের পটভূমিও তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন, তারা নিশ্চয়ই আরো ব্যাপকভাবে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। তবে সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অধ্যাপক পোদ্দার দেশের শিক্ষাসমস্যা বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্বিগ্ন। তার অধিকাংশ পরামর্শই গ্রহণীয়।

প্রত্যাশিত শিক্ষা • লেখক: শেখ শাহবাজ রিয়াদ
প্রকাশক: সুলেখা প্রকাশনী • পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১০ • দাম: ১৫০ টাকা

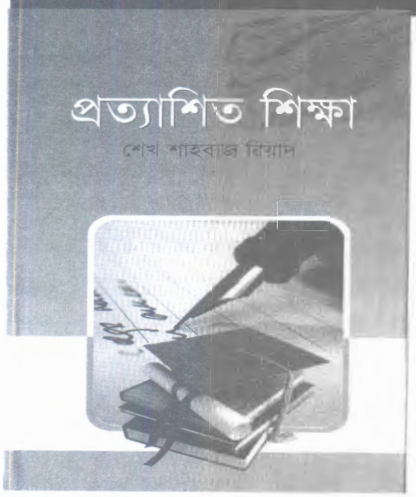

আগেই উল্লেখ করেছি, দু'জন লেখকই ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। অধ্যাপক শেখ শাহবাজ রিয়াদের গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লিখিত। অধ্যাপক রিয়াদ তার প্রাক-ভাষ্যে বলেছেন, 'আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য' এবং 'শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ সীমিত'। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যে বিষয়টির প্রধান ভূমিকা রয়েছে, সেখানে বিনিয়োগ যদি সীমিত হয়, তা হলে আখেরে যে ভাল ফল গোলায় তোলা যাবে না, সে তো নিশ্চিত।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে বলেই অধ্যাপক রিয়াদের মত ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও পর্যালোচনা পাঠক-অভিভাবক-শিক্ষাভাবুকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছেন। তার ওই প্রাথমিক ভাষ্যে লেখক দাবি করেছেন, 'সবকটি নিবন্ধ শিক্ষার গুণগত দিকটিকে সামনে রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে'। তাঁর কথার একটি দীর্ঘ বাক্য উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে, তিনি কতটা উদ্বিগ্ন ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ও প্রতিকারের প্রয়োজনে উচ্চকণ্ঠ। 'বর্তমানে আমাদের দেশে পাবলিক ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নামে যে লিখিত পরীক্ষার সংস্কৃতি চলছে তাতে শুধু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত দিকটিই পরিমাপ হয়, তাদের কর্মদক্ষতা (মনোপেশীজ) এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দিকগুলো (আবেগিক) সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। যার কারণে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবেই মুখস্থমুখী, পরীক্ষামুখী, নম্বরমুখী, সার্টিফিকেটমুখী সর্বোপরি প্রাইভেট ও কোচিংমুখী হয়ে পড়েছে।'

সংক্ষেপে আমাদের দেশের পরীক্ষা ও শিখন-শিক্ষণ ব্যবস্থার সমালোচনা এর চেয়ে ভালভাবে আর প্রকাশ করা যায় না। লেখকের অন্তর্গত কষ্ট, উদ্বেগ এবং প্রায় প্রতিকারহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ সহজেই প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। বইয়ের ভেতরের বিভিন্ন নিবন্ধে এইসব সমস্যা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এমন সমস্যা ছাড়াও অধ্যাপক রিয়াদ ২০১২ সালের অতি দ্রুততায় সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, ক্লাস রুটিনের পরিমার্জনা, সৃজনশীল প্রশ্ন, প্রস্তাবিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি ড্রাইভিং শিক্ষা যে কর্মসংস্থানের বিশাল ক্ষেত্র হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

একেবারে ভিন্ন রীতির একটা নিবন্ধ আছে 'কাজী ইমদাদুল হকের শিক্ষাচিন্তা ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা'। আমার কাছে একটু বিচিত্র ঠেকেছে যে, অধ্যাপক রিয়াদ বা অধ্যাপক পোদ্দার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা আমাদের জন্য যে আজও প্রাসঙ্গিক সেকথাটা অন্তত শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাদের গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিখন উপেক্ষা করে আবার যে বিশ্বভারতীর মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, সেই শিক্ষাদর্শন আজও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

অধ্যাপক রিয়াদ সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়ে একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছেন। এটি খুবই সময়োপযোগী একটি বিষয়। তিনি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রচলনের পাঁচ বছরের পর এ নিয়ে জটিলতা ও শিক্ষক সমাজের ধারণার অস্পষ্টতার কথা বলেছেন। তাঁর ওই নিবন্ধ প্রকাশের পর আরও দুই বছর কেটে গেছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্য, শিক্ষার কোন লক্ষ্য পূরণের জন্য এমন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের গুণগত মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, সে বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সিংহভাগ অবহিত আছেন বলে সাধারণভাবে মনে হয় না। অধ্যাপক রিয়াদের নিবন্ধের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, 'সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক ও উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকবে এবং প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকবে।' রিয়াদ একই সঙ্গে মন্তব্য করছেন যে বিগত চার বছরের প্রশ্নের সমীক্ষা করলে দেখা যাবে প্রশ্ন তৈরি করার সময় এই প্রধান বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করা হয়নি। সৃজনশীল প্রশ্নের যথাযথ সুফল পাওয়ার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। তাঁরা দু'জনেই শিক্ষাক্ষেত্রের যেসব সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ে বিশাল রচনাসম্ভার তো খুবই প্রাসঙ্গিক।

অধ্যাপক রিয়াদের একটি নিবন্ধ আমার বিশেষ মনোযোগ কেড়েছে। এটির শিরোনাম 'প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ও শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে'। রচনাটি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, শিক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুতির সময় সেটা। তাই লেখক এ বিষয়ে এই রচনায় কোন আলোচনা করেননি, কিন্তু করতে পারতেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির শিক্ষা আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারতেন। শিক্ষা এবং পাঠদানের এলাকায় তিনি ৫০টি (পঞ্চাশ) বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তার শ্রমশীলতা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। অধ্যাপক রিয়াদের নিবন্ধগুলি পড়ে বোঝা যায়, তিনিও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত। নিজের পেশাগত অবস্থান থেকে তিনি তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিশ্চয়ই সংস্কারের কাজে নিয়োজিত আছেন।

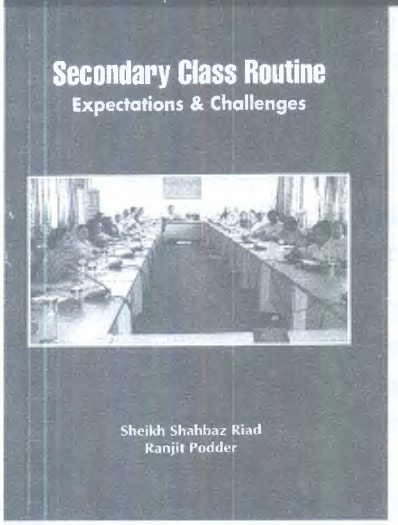

Secondary Class Routine: Expectation & Challenges
লেখক: শেখ শাহবাজ রিয়াদ এবং রণজিৎ পোদ্দার
প্রকাশক: পিআরকে পাবলিশার্স
পৃষ্ঠাসংখ্যা: (২৬ আলোকচিত্রসহ) ৯৪ • দাম: ২০০টাকা

যে বিবেচনায় পূর্বের দু'টি গ্রন্থ সমীক্ষা করা হয়েছে, এই তৃতীয় প্রকাশনাটি তা থেকে বেশ ভিন্নতর। এটা মুদ্রিত অবস্থায় গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হলেও, প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস রুটিন বিষয়ে প্রত্যাশা এবং বাধাসমূহ নিয়ে এটি একটি ক্ষুদ্রাবয়ব মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কর্ম। মাধ্যমিক স্তরের পাঠদান বিষয়ে নানাবিধ সমস্যা আছে। গ্রন্থকারদ্বয় বা গবেষকদ্বয় তাদের প্রাক-ভাষ্যে বলেছেন, মাধ্যমিক স্তর হল, শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড (spinal column of education system)।

মূল প্রতিপাদ্য হল, মাধ্যমিক স্তরে একটি ক্লাসের দৈর্ঘ্য যদি ৬০ মিনিট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, তা হলে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ আরো ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। গবেষকদ্বয় তার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের গবেষণা থেকেই এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, আমাদের স্কুলগুলিতে বছরের শতকরা ৫০ ভাগ দিন ছুটি থাকে। আবার যদি ওই স্কুল বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে কর্মদিবস অন্তত ৪৫ দিন কমে যায়। গবেষকদ্বয় অবশ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের কথা বলেননি, অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে স্কুল বন্ধ থাকার বিষয় উল্লেখ করেননি।

গবেষণা-কর্ম হিসেবে যা যা ব্যবহার করা উচিত তার সবই এই গ্রন্থে করা হয়েছে। সেদিক থেকে কাঠামোগত কোন ঘাটতি নেই। উল্লেখ করা উচিত যে, সরকার ও দাতা সংস্থার যৌথ উদ্যোগ-Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project (TQI-SEP) -এর আনুকূল্যে এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। বোধ করি, প্রকল্পের টাকা থেকেই এই গ্রন্থ মুদ্রণের অর্থায়ন করা হয়েছে, যদিও প্রকাশক হিসেবে একটি সংস্থার নাম আছে।

প্রাথমিক প্রয়োগের তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকদ্বয় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ করেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট সামষ্টিক সভা (Focus Group Discussion) করেছেন এবং পর্যবেক্ষণের রীতি ব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদনটি অবশ্য বেশ সংক্ষিপ্ত। প্রাক-কথন, সূচিপত্র, কর্তাব্যক্তিদের শুভেচ্ছায় লেগেছে ১৪ পৃষ্ঠা; মূল প্রতিবেদন ২০ পৃষ্ঠা; পরিশিষ্ট ৫৮ পৃষ্ঠা এবং বর্ণিল ছবি ২৬ পৃষ্ঠা-এই নিয়ে সামগ্রিক প্রকাশনা। যে কোন উচুঁ মানের গবেষণার মত এই গ্রন্থের সূচনায়ও একটা প্রস্তাবনার সারকথা বা Abstract জুড়ে দেয়া হয়েছে। তার প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, TQI-SEP প্রথম পর্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য হল, সনাতন চরিত্রের শিক্ষকমুখী শিখনের অংশগ্রহণমূলক শিখনের প্রচলন। সাধারণভাবেই বলা যায় যে, যদি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই ক্লাসের সময়সীমা বর্ধিত করতে হবে। আরো যেসব খুবই জরুরি বিষয়ে নজর দিতে হবে, তা হল, বিষয়-বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকার প্রয়োজন হতে পারে। Abstract-এর বিপরীত পৃষ্ঠায় আবার একটা ভূমিকাংশ আছে। সেখানে বেশ ভারী বাক্যের সঙ্গে নানাবিধ পরিসংখ্যান আছে। গবেষকদ্বয় মন্তব্য শুরু করেছেন এভাবে, 'কোন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের (implement) জন্য একটা উদ্ভাবনী (innovative) সমাজ দরকার। এর পরের বাক্যে বলা হচ্ছে, শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব (responsibility) ও লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। এমন সব আপ্তবাক্যের সঙ্গে ব্যবহারিক দিক থেকে ক্লাস রুটিন বিষয়ে নিরীক্ষামূলক গবেষণা TQI-SEP-এর কর্মপন্থার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। এরপর গবেষণা-কর্মের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে। গবেষণার জন্য মোট ১৮ বিদ্যালয়কে বাছাই করা হয়েছিল। অবশ্য উন্নত গবেষণার জন্য এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট নয়, যদিও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও ফলাফল অপরিবর্তিত থাকত। ওই আঠারোর মধ্যে ৩টি শুধু ফেনীর অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিভাগে, বাকি ১৫টি স্কুলই ঢাকা বিভাগের, আবার সেই পনেরোর ৬০% হল ঢাকা মহানগরীর। যেকোন মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য এমন বাছাই মানসম্মত নয়।

পরিশিষ্ট অংশে এমন কয়েকটি নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে, যার সঙ্গে মূল গবেষণা প্রস্তাবের যোগ অত্যন্ত গৌণ। এমন সব প্রায়োগিক দুর্বলতার পরও গবেষকদ্বয় তাদের কাজের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে যোগ্যতা দেখিয়েছেন। সরকারি পর্যায়ে নেহাতই বাস্তবিক কারণে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা যায়নি। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার সপক্ষে এবং এর কার্যকারিতার জন্য এই গবেষণা একটি মূল্যবান জরিপ। একটা ছোট ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্যের দেশসমূহের নামোল্লেখ করতে গিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এই দু'টি দেশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ হিসেবেই স্বীকৃত। ভবিষ্যতে গবেষকদের এরকম আরও কাজের প্রতীক্ষায় রইলাম।

শর্বরী আলোময়ী
লেখক ও শিক্ষক

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর এডুকেশন ২০১৬
স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচি

মানসম্পন্ন শিক্ষার পক্ষে সচেতনতা বাড়াতে এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (GCE) পৃথিবী জুড়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর-এ জাতিসংঘে গৃহীত SDG-৪ এর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে GCE "গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ" (GAW) এর পরিবর্তে ''শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ'' (GAWE) পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এবছর এই সপ্তাহটি পালিত হয়েছে ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত । বরাবরের মতো বাংলাদেশে জিসিই-র সমন্বয়ক সংস্থা হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান এবারও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থা, শিক্ষক সংগঠন, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রভৃতির সাথে সম্মিলিতভাবে এই "শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ'' (GAWE) উদযাপন করেছে। গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর এডুকেশন-২০১৬ উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ২৪টি জেলায় অভিযান-এর সহযোগী সংগঠন এবং শিক্ষক সমিতির সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। । সহযোগী সংগঠন স্পিড ট্রাস্ট (বরিশাল), কোস্ট ট্রাস্ট (ভোলা), বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (পিরোজপুর), ইপসা (চট্টগ্রাম), ব্র্যাক (লক্ষীপুর), বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (চাঁদপুর), কারিতাস (ময়মনসিংহ), বাংলাদেশ গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (নরসিংদী), স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (নেত্রকোনা), রাসিন (ফরিদপুর), আইজল (জামালপুর), শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (মুন্সীগঞ্জ), জাগ্রত যুব সংঘ (খুলনা), উদয়ন বাংলাদেশ (বাগেরহাট), সেতু (কুষ্টিয়া), স্ব-দেশ (সাতক্ষীরা), রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (যশোর), আলো (নাটোর), স্ব-উন্নয়ন (রাজশাহী), শার্প (সিরাজগঞ্জ), সলিডারিটি (কুড়িগ্রাম), দেবী চৌধুরানী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (রংপুর), আইডিয়া (সিলেট), ব্রাক (হবিগঞ্জ) জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি সমূহ আয়োজন করে। এ বছর সপ্তাহটির প্রতিপাদ্য ছিল Fund the Future: Education Rights Now! যার বাংলা ভাবান্তর করা হয় ''আগামীর জন্য বিনিয়োগ, শিক্ষার অধিকার চাই-এখনই''। সপ্তাহটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর গোলটেবিল বৈঠক, প্রেস ব্রিফিং, র‍্যালি, অভিভাবক সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদান, শিশুদের চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিগুলোতে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- ঝরে পড়া রোধে গ্রামের ন্যায় শহরেও উপবৃত্তি চালু করা।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা
- সরকারিভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম পুনরায় চালু করা এবং এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপেয় পানি এবং উন্নত স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি
- দুস্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদানের জন্য বরাদ্দ
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বরাদ্দের সাথে সাথে সরকারিভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
- চর, হাওর ও পাহাড়ী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা
- প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা এবং তৃতীয় লিঙ্গ, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরী, মাল্টিমিডিয়া কক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় বাজেট বরাদ্দ রাখা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝরে পড়া হার ঠেকাতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপর বাজেট বৃদ্ধি করা
- শিক্ষক প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা খাতে এডিপির কমপক্ষে ২৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে
- বিজ্ঞানমনস্ক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একমুখী শিক্ষা চালু এবং সাধারণ শিক্ষার স্থলে জীবনমুখী, আয় বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা জোরদার করা
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিনোদন ও সহপাঠ্যক্রম এর উপর গুরুত্ব দেয়া
- কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা, লেখাপড়া স্কুল কেন্দ্রিক করা
- বিদ্যালয়ে আইসিটি শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান।

কাজী আশিক এলাহী

গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্টেপ-কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চাকরি মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিসি'র তত্ত্বাবধানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ২ হাজার কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থী ও ২৮টি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করেন। চাকরি মেলায় প্রায় ১ হাজার ২ শত দক্ষ কর্মীর চাকরির সংস্থান হয়। মেলা উপলক্ষে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা স্তরে চাকরি মেলা: বিদ্যমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশ' জন প্রতিনিধি।

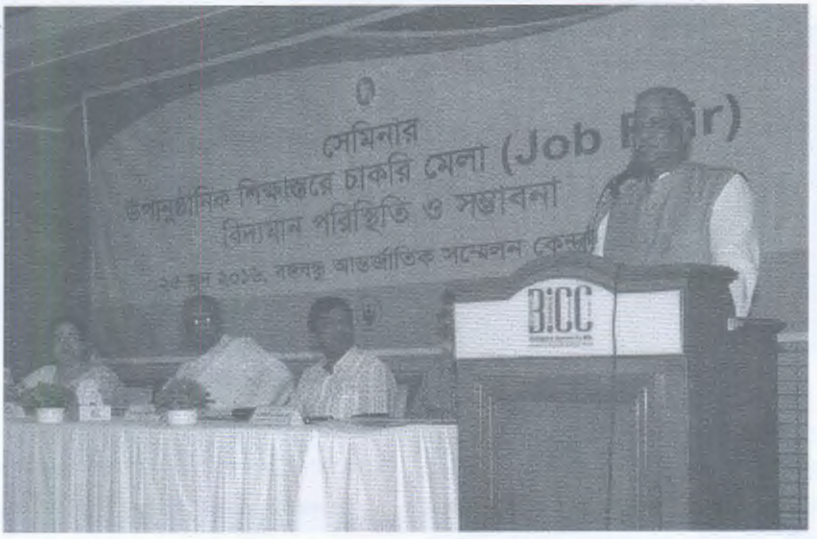

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাকরি মেলা ২০১৬ উদ্বোধন করেন এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, মোহাম্মদপুর ৩১, ৩৩ ও ৩৪ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলেয়া সরোয়ার ডেইজি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক ড. রুহুল আমিন সরকার। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীর সভাপতিত্বে আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিকেটিটিসি)-এর অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ড. মোঃ সাকাওয়াৎ আলী। স্বাগত বক্তব্য দেন স্টেপ-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ ইমরান (অতিরিক্ত সচিব) এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য বর্ণনা ও উপস্থাপনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

চাকরি মেলায় যেসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ দেয় সেসব বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ছিল ইউসেপ, ব্র্যাক, মায়ের ডাক ফাউন্ডেশন, এসওএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, মট্স-কারিতাস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, টিসিএম, টিএমএসএস, সেভ দ্য চিলড্রেন, পিআরডিএস ইত্যাদি এবং সরকারের স্টেপ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সংস্থার মধ্যে ছিল বিকেটিটিসি, বিজিটিটিসি, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা টিটিসি, গ্রাফিক্স আর্ট ডিজাইন ইনস্টিটিউট, মনটেজ ট্রেনিং সেন্টার, ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি। চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল ডিবিএল গ্রুপ, ডাচ্-বাংলা প্যাকেজিং লিমিটেড, অন্যরকম ইলেকট্রনিক্স, সুপার স্টার লিমিটেড, পাওয়ার কনসেপ্ট, মেটাডোর, কোকাকোলা, গোল্ডেন হারভেস্ট, হাতিল কমপ্লেক্স লিমিটেড, বাংলাদেশ ল্যামস্ লিমিটেড, আকিজ ফুড এ্যান্ড বেভারেজ, টিভিএস অটো বাংলাদেশ, র‍্যাংগস মটরস লিমিটেড, বেঙ্গল গ্রুপ, প্রাণ-আরএফএল, এপেক্স হোসেন গ্রুপ, ফিলিপস্, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সিস্টেম, পেট্রোনুজ (রিয়েল এস্টেট গ্রুপ), আর্কিনোভা (রিয়েল এস্টেট গ্রুপ), ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, বেক্সিমকো টেক্সটাইল, গ্রীন হাউজিং এ্যান্ড এনার্জি,ম্যাক্স মার্কেটিং, ট্রান্সটেক, সেনা কল্যাণ সংস্থা, উর্মি গ্রুপ, জবস বিডি ডট কম। চাকরি মেলায় যারা তৎক্ষণাৎ কোনো চাকরি পায়নি, কিন্তু জীবন বৃত্তান্ত/দরখাস্ত জমা দিয়েছে। ভবিষ্যতে তাদেরও পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এ উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি বলেন, আমাদের দেশের ছেলেরাও কাজ করতে চায়। কিন্তু আমরা তাদের সে সুযোগ দিতে পারছি না। অনেক শিক্ষার্থী নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে কিন্তু কারিগরি শিক্ষা পায় না। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আপনাদের মতো আমিও মনে করি, টিভিইটি'র জন্য আলাদা মিনিস্ট্রি করতে হবে, টিভিইটি'র জন্য আলাদা বরাদ্দ দিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি বলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক যুব বয়সী। এ যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ একদিন বিশ্ব অর্থনীতিতে চমক সৃষ্টি করবে। আজকের এ চাকরি মেলায় আগত চাকরিপ্রার্থী টিভিইটি গ্র্যাজুয়েটদের দেখে আমার আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। আমরা সেই বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি।

সম্মানিত অতিথি আলেয়া সারোয়ার ডেইজি বলেন, আজকের এ অনুষ্ঠান ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে সুন্দর পদক্ষেপ। এ ধরনের কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হবে, যা সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনবে, নিম্নবিত্ত ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবার উপকৃত হবে। আমি আয়োজকদের অনুরোধ করব, নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা একটি মেলা করা যায় কিনা। সে বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

সম্মানিত অতিথি ড. রুহুল আমিন সরকার বলেন, উপানুষ্ঠানিক স্তরে চাকরি মেলা আয়োজনের উদ্যোগ দেশে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ও নব-ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। আমরা এনএফই নিয়ে কাজ করি, জীবনব্যাপী শিক্ষাও আমাদের কাজের অংশ। এ শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সাক্ষরতার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করব।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, চাকরি মেলা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা চাকরিদাতা ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলাম। আশা করি এ চেষ্টায় আমরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছি। এ সুযোগে যাদের স্কিল আছে তারা চাকরি পেয়েছে আর যাদের কর্মী দরকার তাদেরও সে অভাব পূরণ হয়েছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করব।

সেমিনারে উপস্থিত মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তরের প্রতিনিধি, দাতাসংস্থার প্রতিনিধি, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা বেসরকারি পর্যায়ে চাকরি মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে এবং দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিকাশে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা তুলে ধরেন:

- বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং দেশের সব এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।
- ২০২১ সালের মধ্যে সরকারের টিভিইটি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্টেপ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্কিল সেক্টর সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।
- নারীদের জন্য কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এজন্য দেশের সকল উপজেলায় অনতিবিলম্বে একটি করে মহিলা কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দক্ষ নারী কর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র চাকরি মেলা আয়োজন করা জরুরি।
- বেকিং তথা রন্ধনশিল্প, ব্লক-বাটিক-বুটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নারী কর্মীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা এবং সকল কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মকানুন সহজতর করা জরুরি।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ ও তাদের উপযোগী কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।
- এনটিভিকিউএফ-কে সামনে এগিয়ে নেওয়া দরকার এবং এজন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে এনটিভিকিউএফ-প্রথম পর্যায়ের দক্ষ কর্মীদের নিয়োগের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- দক্ষ কারিগর তথা দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষানিবিশী বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে শিক্ষানিবিশ কর্মীদের কারিগরি ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র দপ্তর ও মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য আলাদা বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিটিইবি'র সক্ষমতা উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।
- এনিটিভিকিউএফ-প্রথম থেকে পঞ্চম লেভেলের ও আরপিএল-এর আওতায় সনদপ্রাপ্তদের জন্য বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং এনটিভিকিউএফ-কে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে একটি কেন্দ্রীয় কর্মনিয়োগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং প্রতিটি জেলায় এর শাখা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা জরুরি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে গণসাক্ষরতা অভিযান এনএসডিসি'র সহায়তায় ২০১৩ সালে প্রথম বারের মতো উপানুষ্ঠানিক স্তরে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য চাকরি মেলা আয়োজন করে। ২০১৩ সালের ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সে চাকরি মেলায়ও প্রায় ৭ শত দক্ষ কর্মীর চাকরির সংস্থান হয়। উপর্যুক্ত উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিগত ৩ বছরে বেশ কয়েকটি চাকরি মেলা আয়োজন করা হয় এবং এসব মেলায় প্রায় ৬ হাজার লোকের চাকরির সংস্থান হয়। মূলত কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত দক্ষ কর্মীদের চাকরির সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী চাকরি মেলা আয়োজনের সংস্কৃতি চালু করাই গণসাক্ষরতা অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আবু রেজা

আগামী বছর ৩৬ কোটি পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আগামী ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৬ কোটি ১২ লাখ পাঠ্যবই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী রোববার রাজধানীর মতিঝিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে(এনসিটিবি) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ৩টি পাঠ্যপুস্তক সাশ্রয়ী মূল্যে বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিবারের মতো আগামী ১ জানুয়ারী সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের হাতে যথাযথ মানসম্পন্ন বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে এনসিটিবি ২০১৭ সালের জন্য ৩৬ কোটি ১২ লাখ পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রক্রিয়া নিয়মিত তদারকি করছে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যপাঠ, বাংলা সহপাঠ ও ইংলিশ ফর টুডে বই, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নতুন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালনরত অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, এনসিটিবির সদস্য প্রফেসর ড. রতন সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত বক্তৃতা করেন।

সমকাল ১১.০৭.২০১৬

১০ দিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তথ্য দিতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা শিক্ষার্থীদের নাম-পরিচয় সরকারকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ঈদের ছুটির পর গতকাল রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া এই নির্দেশের কথা জানান মন্ত্রী।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে করণীয় নিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রীর বক্তব্যের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল বিকেলে এক অফিস আদেশ জারি করেছে। এতে বলা হয়, যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এরপর তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার পর অনুপস্থিতির কারণ সন্দেহজনক হলে লিখিতভাবে ওই শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করবে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এই তথ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। মহানগর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ডিসির কাছে তথ্য দেবে। আর সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) অবহিত রেখে ডিসির কাছে দেবে। তথ্য পাওয়ার পর ডিসি পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।

এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করবে ও কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির কারণ সন্দেহজনক হলে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করবে। ইউজিসি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এসব কার্যক্রম তদারকি করবে। এদিকে ঢাকা কলেজে একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কারও সন্তান নিখোঁজ হলে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত লেখাপড়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উঠতি বয়সী শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ ও চলাফেরার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

প্রথম আলো ১১.০৭. ২০১৬

ইউনেসকোর প্রতিবেদন

১০ শিশুর একজন স্কুলে যাওয়ার সুযোগবঞ্চিত

সারা বিশ্বে ২৬ কোটি ৩০ লাখ শিশু স্কুল যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেসকো এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। স্কুলবঞ্চিত শিশুদের এই সংখ্যা প্রতি ১০ জনে একজন। ইউনেস্কো মনে করছে, স্কুলবঞ্চিত শিশুদের এই হার ২০৩০ সালের মধ্যে সব শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার জাতিসংঘের লক্ষ্যকে কঠিন করে তুলবে। প্রতিবেদনে এও বলা হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোর স্কুলবঞ্চিত শিশুদের সংখ্যার 'ওঠা-নামা' দেখা গেলেও ২০০০ সালের তুলনায় অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ২০০০ সালে ৩৭ কোটি ৪০ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব শিশু স্কুলের যাওয়ার সুযোগ পায় না তাদের একটা অংশ সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করে। আর বাকিরা মেয়েশিশু, যারা এমন সমাজে বাস করে যেখানে নারীদের শিক্ষাকে সমর্থন দেওয়া হয় না। এছাড়া কিছু শিশু স্কুলবঞ্চিত রয়েছে, যারা তাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না থাকায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। স্কুলের সুযোগবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই কিশোর বয়সী বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

এক বিবৃতিতে ইউনেসকো মহাপরিচালক ইরিনা বোকাভা বলেন, 'স্কুল শুরুর বয়স থেকেই শিশুদের ভর্তিভুক্ত করা এবং এরপর যেন শেখার চক্রে থাকে সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। স্কুলবঞ্চিত শিশুদের প্রতিটি পর্যায়েই বাধা চিহ্নিত করে বিশেষ নজর দেওয়া হবে মেয়েদের শিক্ষায়, যারা এখনো সবচেয়ে বড় অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে।' জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো গত বছরে ২০৩০ সালের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে শিশুদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। বোকোভা বলেন, 'নতুন তথ্য দেখাচ্ছে, আমরা যদি এসব লক্ষ্য অর্জন করতে চাই তাহলে সামনে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।' প্রতিবেদনে বলা হয়, সশস্ত্র সংঘাত শিক্ষার পথে একটি বড় বাধা। সারা বিশ্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী স্কুলবঞ্চিত দুই কোটি ২০ লাখ শিশু সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে।

কালের কণ্ঠ ১৮.০৭.২০১৬

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেএসসি পরীক্ষা এ বছরই

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বছর থেকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা হবে। পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা শেষে রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান।

কয়েক মাস আগে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ এবং পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা বাতিলে সিদ্ধান্ত নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী হবে বলে ২১ জুন জানিয়েছিলেন গণশিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু ২৭ জুন এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উঠলে মন্ত্রিসভা তা অনুমোদন দেয়নি। একই সঙ্গে বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করে উপস্থাপনের নির্দেশণা দেয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষা এ বছরও থাকবে বলে সিদ্ধান্ত দেয় মন্ত্রিসভা। এ বছর জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা তদারকির দায়িত্বে কোন মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকছে-এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা গত বছর পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়েছে। দুই দিন আগেও আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের আওতায় এলেও এখনও প্রক্রিয়াগত অনেক কাজ বাকি। এ কারণে আমরা আলাদা কোনো বোর্ড তৈরি করে পরীক্ষা নিতে পারব না।

আলোকিত বাংলাদেশ ১৮.০৭.২০১৬

পাহাড়ে শিশুদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে শিখন স্কুল

কক্সবাজারের নাইক্ষ্যংছড়ি ও রামুর দুর্গম এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে শিখন স্কুল। শিক্ষাবঞ্চিত শিশু ও তাদের ঝরে পড়া রোধে নাইক্ষ্যংছড়ির দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২২টি শিখন স্কুল ও ১০টি শিখন কেন্দ্র। এসব স্কুলের শিশুরা কেউ ডাক্তার কেউবা আদর্শ শিক্ষক, আবার কেউ বড় সরকারি অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সেভ দ্যা চিলড্রেনের কারিগরি সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা কোডেক এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে।

কোডেক সূত্র মতে, এ কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে শিখন স্কুল ও শিখন কেন্দ্র। শিখন স্কুলে একটি নির্দিষ্ট কারিকুলাম অনুযায়ী লেখাপড়া হচ্ছে। শিখন কেন্দ্রে রয়েছে ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে ৩ বছর মেয়াদী প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। কক্সবাজারে ১০০টি শিখন স্কুল ও ৫৫টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর, সোনাইছড়ি, ঘুমধুম ও বাইশারী ইউনিয়নের বিভিন্ন দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় ২২টি শিখন স্কুল ও ১০টি শিখন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এতে নাইক্ষ্যংছড়িতে প্রায় সাড়ে ৭০০ শিশু নতুন করে শিক্ষা আলো পেয়েছেন। শিখন স্কুলের শিক্ষক সেলিনা আক্তার বলেন, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ঠাণ্ডাঝিরি, মাঝের চরা ও বড়ছনখোলা। এসব গ্রামে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রামের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতে হতো ৪ কিলোমিটার দূরে। হাঁটতে হতো দুর্গম পাহাড়ি পথ। এত নানা কারণে ও আর্থিক অনটনে লেখাপড়া বন্ধ করে কাজে যোগ দিয়েছিল অনেক শিশু। এখন তারা বাড়ির পাশেই শিখন স্কুলে পড়ালেখা করছে।

কোডেকের কক্সবাজার সদরের কো-অর্ডিনেটর মোঃ আজিজুল হক বলেন, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবানে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার কম। এ বিবেচনায় এ অঞ্চলের শিশুদের স্কুলমুখী করতে এ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আগে যেসব শিশু স্কুলে যেত না, তারা এখন স্কুলে এসে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু আহমদ বলেন, কোডেক কর্তৃপক্ষ দুর্গম এলাকায় ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষিত করতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। আমরাও তাদের এ বিষয়ে সহযোগিতা করছি। কারণ বর্তমান সরকার শিক্ষাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে।

আলোকিত বাংলাদেশ ২৪.০৭. ২০১৬

এক শিক্ষক দিয়েও চলে সরকারি প্রাথমিক স্কুল!

হাওরের জেলা সুনামগঞ্জে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষকসংকটের কারণে ঠিকমতো পাঠদান হয়না। আবার শিক্ষক যাঁরা আছেন, তাঁরাও সময় মেনে স্কুলে যান না। কোনো কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষক দিয়েও চলছে। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে ভঙ্গুর।

সরেজমিনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এই চিত্র দেখা গেছে। বর্তমানে এই জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১ হাজার ৪২৬টি। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৩৬২টি ও সহকারী শিক্ষকের ৫৭৭টি পদ শূন্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হজরত আলী জানালেন, জেলার বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে তাহিরপুর, জগন্নাথপুর ও ধরমপাশায় শিক্ষকের সংকট বেশি।

তাহিরপুরে গিয়ে জানা গেল, এই উপজেলায় ১৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ৫৮৪টি। এর মধ্যে সম্প্রতি ৩৪ জন নিয়োগ দেওয়ার পরও সহকারী শিক্ষকের ৬৮টি পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষকের ১৩১টি পদের (২টি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ নেই) মধ্যে কর্মরত আছেন ৭১টিতে। বাকি ৬০টি বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। তাহিরপুরের একজন শিক্ষকনেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, এখানে বেশ কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে মাত্র দুজন কিংবা তিনজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। তবে জেলা ও উপজেলা শহরের কাছের বিদ্যালয়গুলোতে উল্টো চিত্র। সুনামগঞ্জ সদরের গৌরাং ইউনিয়নের নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে জানা গেল, এই বিদ্যালয়ে আটজন শিক্ষক। তাঁদের একজনকে অবশ্য অন্য বিদ্যালয়ে সংযুক্তিতে পাঠানো হয়েছে। আরেকজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। বাকি ছয়জনের মধ্যে গতকাল শনিবার চারজন উপস্থিত ছিলেন। দুজন নৈমিত্তিক ছুটিতে। প্রধান শিক্ষক মোছা. হাওয়ারুন্নেসা জানালেন, চারজন শিক্ষক জেলা শহর থেকে যাতায়াত করেন। এই বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ১৮৪ জন হলেও গতকাল ১০০-এর কিছু বেশি উপস্থিত ছিল।

শিক্ষকসংকটের কথা জেনেও সমাধান করতে পারে না স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, তাঁদের হাতে প্রেষণ বা সংযুক্তির (বদলি না করেও যেখানে বেশি শিক্ষক, সেখান থেকে কাউকে কম শিক্ষক থাকা স্কুলে পাঠানো) ক্ষমতা না থাকায় সমস্যা জেনেও কিছু করতে পারেন না। শুধু শিক্ষকসংকট নয়, শিক্ষা প্রশাসনে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় তদারকি কার্যক্রম ভালোমতো হচ্ছে না বলে অভিভাবকেরা জানিয়েছেন।

প্রথম আলো ১১.০৭. ২০১৬

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টমে উন্নীতকরণ চ্যালেঞ্জের মুখে

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও অবকাঠামো সংকট। এছাড়া সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় থাকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ও শিক্ষকদের দায়িত্বভার কাদের কাছে থাকবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইতিমধ্যেই ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রধান করে গঠন করা এই কমিটিতে শিক্ষাবিদসহ শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা রয়েছেন। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এই সংকট কাটাতে করণীয় ঠিক করা হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য উঠে আসে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ২০১১ সালেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হয়েছে ২০১৬ সালে। আমরা ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুলেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এক ঘোষণায়ই সব প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুলে ফেলতে পারি। কিন্তু শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটের কারণে তা হচ্ছে না। অনেকেই বলেন আমরা দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত না। আমি বলব, এটা সঠিক না। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে যেসব শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, তা বলতে গেলে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই। কমিটি দয়া করে তাদের নিয়োগ দিয়েছে। বরং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পদ্ধতি অনেক যাচাই বাছাই করে হয়। আর এই নিয়োগের শিক্ষকরাই তো বর্তমানে কিছু স্কুলে পড়াচ্ছেন, তাহলে তারা অন্য স্কুলেও পড়াতে পারবেন।

সমকাল ৩১.০৭.২০১৬

ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন/ এনজিও :'শিক্ষার বিভিন্ন মানের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক জাতিসংঘভিত্তিক সম্মেলন

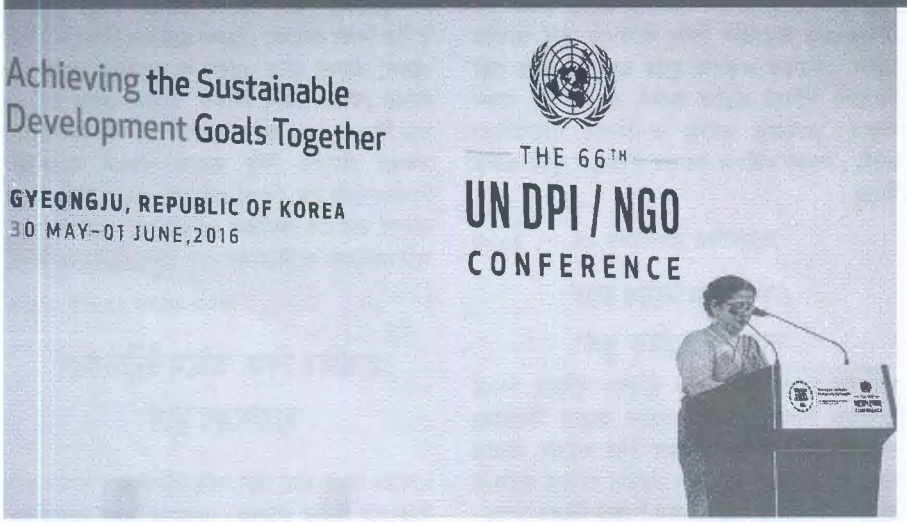

গত ৩১ মে ২০১৬ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর ৪ নং গোল-সবার জন্য একীভূত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরীর উদ্দেশ্যে রিপাবলিক অফ কোরিয়ার গোয়েন্‌জুতে জাতিসংঘের কনফারেন্স সেন্টারে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণের পাশাপাশি আরও নানাবিধ সমস্যা নিয়ে প্রতিনিধিবৃন্দ কথা বলেন।

জাতিসংঘের জনযোগাযোগ/এনজিও বিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাশেদা কে. চৌধূরী, সহ-সভাপতি বৈশ্বিক শিক্ষা অভিযান (Global Campaign for Education) এবং নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান বলেন, শিক্ষা বর্তমানে সবার মৌলিক অধিকার না হয়ে বাজারজাত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান গুণগত দূরত্ব বিবেচনা করলে এই দুশ্চিন্তার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সভার প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, সহজলভ্য, নিরাপদ এবং সবার জন্য একীভূত শিক্ষার অভাবে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।

তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি বিশ্বের সকল নাগরিকদের শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে আমাদের সন্তান, তরুণ এবং বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা কি আমরা মেনে নিয়েছি যে যেখানে তারা ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকবে ?

সভায় উপস্থিত সবাইকে মিসেস চৌধূরী স্মরণ করিয়ে দিলেন, সত্যিকার অর্থে যদি আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই তাহলে প্রত্যেককে অবশ্যই সর্বজনীন মানবাধিকার সনদেন শর্তসমূহ মেনে চলতে হবে।

'তিনি বললেন, "চলুন আমরা এমন একটি বৈশ্বিক সমাজের স্বপ্ন দেখি এবং সকলে মিলে কাজ করি, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ নয়, পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ এবং সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত।

টিওপিসটা বিরুন্‌গী মায়ানিয়া, উগান্ডা শিক্ষা কর্মসূচির ডেপুটি ডিরেক্টর এবং বৈশ্বিক শিক্ষার অর্থায়নের আর্ন্তজাতিক কমিশনার তার 'শিশু এবং যুব; বর্তমান সময়ে আগামীর বিশ্বনাগরিক' শীর্ষক গবেষণায় আজকের শিশু এবং তরুণদের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বলেন, শিক্ষায় অর্থায়নকে বিভিন্ন দেশের সরকার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কখনও কখনও দাতা গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন এজেন্সিদের মাধ্যমে তা বাধাগ্রস্ত হয়।

মিসেস মায়ানিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, মানপরীক্ষণ এবং লিগ টেবিলের কারণে শিক্ষকদের অনেক সময় 'টিচ টু দা টেস্ট' বা 'পরীক্ষার জন্য পড়ানোতে' উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং শারিরীক শিক্ষা, গান ও চিত্রকলার মত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী পাঠ্যক্রম নির্ধারণে এ ধরণের সংকীর্ণতাকে পরিহার করার জন্য পর্যবেক্ষণ (monitor) করতে হবে।

তিনি আরও উপদেশ দেন, সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন দাতাসংস্থা, কোম্পানী এবং একই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আর্ন্তজাতিক মূল্যায়ন এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারণে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিত হতে হবে।

শিশু এবং যুব; বর্তমান সময়ে আগামীর বিশ্বনাগরিক' বিষয়ে তার বক্তব্যের পূর্বে, ইউনহি ইয়ুং, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোরিয়া IVECA সেন্টার এবং প্রতিষ্ঠাতা IVECA সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলিং জাতিসংঘ সংবাদ সংস্থাকে বলেন, বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন যেখানে সব ধরনের শিক্ষার্থীরা যাতে সহপাঠী হিসেবে পড়ালেখা করতে পারে।

তিনি আরও যোগ করলেন, আমরা একীভূত বৈশ্বিক স্কুল ব্যবস্থা তৈরি করতে চাই যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, মনের ভাব ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে।

মিসেস ইয়ুং আরও বলেন যে, আন্তঃসাংস্কৃতিক উপযোগিতা প্রচারের মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীদের একে অপরকে বোঝার সুযোগের কারণে ও একে অপরকে সাহায্য করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব নিশ্চিত হবে। .

দুদিনব্যাপী এ কর্মশালায় ৪ টি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চমটি জাতীয় আয়োজক কমিটি আয়োজন করে। এছাড়াও এই কনফারেন্সে ৪৫ টি কর্মশালা, ৬৯টি প্রদর্শনী এবং তরুণদের নিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরাম-এর সভা

গত ২৩ জুন বিকেল ৩ টায় গণসাক্ষরতা অভিযানের সভা কক্ষে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের আহ্বায়ক কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সম্মানিত আহ্বায়কসহ উপস্থিত সকল সদস্য এ ফোরামের কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে মতামত দেন। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীও এসডিজি'এর লক্ষ্যমাত্রা ৪ এর আলোকে জীবনব্যাপী শিক্ষা কাঠামোর আওতায় সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের বিস্তৃতি সাধনে এ ফোরামের কার্যকর ভূমিকা পালনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে ফোরামের করণীয়সমূহ নির্ধারণ করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি পরবর্তী সময়ে ফোরামের সক্ষমতা বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রসারের লক্ষে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রদান করে।

উপর্যুক্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২১ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৩ টায় সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামের একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ

সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ড. মোস্তাক রাজা চৌধুরী, ভাইস চেয়ার, ব্র্যাক ও রাশেদা কে. চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান।

সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে সংশ্লিষ্ট এনজিওদের নিয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠনপূর্বক সু-নির্দিষ্টভাবে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা নিয়ে একটি উদ্ভাবনী প্রস্তাব প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপর্যুক্ত লক্ষ্যে ২৬ জুলাই ২০১৬ গণসাক্ষরতা অভিযানে পুনরায় মিলিত হয়ে এই প্রকল্পের কাঠামো প্রণয়নের জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

উর্মিলা সরকার

তরুণদের সঠিক পথে পরিচালনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ও ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ১৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বিভ্রান্ত ও বিপথদগামী তরুণদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, চেয়ারম্যান, আইএইচডি ও প্রধান সমন্বয়কারী, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। আলোচনা সভায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধি ও মিডিয়াসহ প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

গোলটেবিল আলোচনা সভার সম্মানিত অতিথি জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী এ ধরনের সময়োপযোগী সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকে তরুণরা বিপথগামী হওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের দেশে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি হয় না, রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি, ধর্মের অপব্যাখ্যা ইত্যাদি। আমাদের অনেক পরিবারে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাব রয়েছে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারকেও এ দায় নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি অনুরোধ জানান।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ

কমিউনিটিএডুকেশন ওয়াচ মূল্যায়ন: অংশীজনের মতবিনিময় সভা

২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান এর উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ মূল্যায়নের ওপর অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে.চৌধূরী।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এর মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন ড. মোঃ এহসানুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান এর কাউন্সিল সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্য, অন্য বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষণা দলের সদস্য, শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি এবং গণসাক্ষরতা অভিযান এর সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ -

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ একটি জন-উদ্যোগ ছিল

- কর্ম এলাকার বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি হার বেড়েছেও ঝরে পরা হ্রাস পেয়েছে
- বিদালয়ের সুশাসন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রফেসর সালেহ আহমেদ, নুরুল আমিন, কাজী ফারুক আহমেদ, শফি

আহমেদ, জ্যোতি এফ গোমেজ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কাউন্সিল সদস্য মোঃ হাবিবুর রাহমান, উপ-পরিচালক জনাব কে. এম. এনামুল হক এবং বিভিন্ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য অনেকে।

পরিশেষে জনাব রাশেদা কে.চৌধূরী সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির উপযোগিতার কথা তুলে ধরেন।

মোঃ বে-নজির শাহ্ শোভন

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থা নিয়ে ওরিয়েন্টেশন

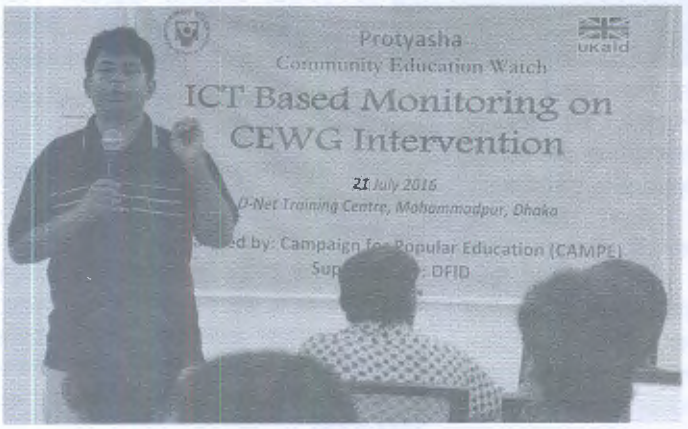

২১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান এর উদ্যোগে ICT Based Monitoring on CEWG Intervention বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়।

D-Net Training Center-এ আয়োজিত এই ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন পার্টনার সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সংস্থার কর্মীবৃন্দ এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কর্মীবৃন্দ। অভিযানের উপ-পরিচালক জনাব কে. এম. এনামুল হক উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি মনিটরিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলেন যে, এটি কেবল মাত্র আভ্যন্তরীন রিপোর্টিং ব্যবস্থা নয় এটি Global platform হিসাবেও কাজ করবে। সভাতে মনিটরিং এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশা প্রকল্পের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের তথ্য প্রবাহ উপস্থাপনা করেন মোঃ আশিক ইকবাল। তিনি বলেন, একই বিদ্যালয়ে বারংবার সভার প্রবণতা কমাতে হবে এবং RBM কে প্রাধান্য দিতে হবে এবং কাজ করার পূর্বে Value for Money চিন্তা করে কাজ করতে হবে বিভিন্ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ বলেন যে এই সভায় আলোচিত বিষয় তাদের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা শেষে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রবর্তিত নতুন এমআইএস মোবাইল এপস উপস্থাপন ও তার ব্যবহার বিধি আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে এপস ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক রিপোর্ট প্রদান ও বিভিন্ন কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত সকল সদস্য।

মোঃ বে-নজির শাহ্ শোভন

স্মরণসভা: শিরিন বানু মিতিল

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ৩১ জুলাই, বিকাল ৪.০০টায় বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা, নারী অধিকার, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী ও সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম সদস্য শিরিন বানু মিতিল-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের নারী অধিকার, মানবাধিকার আন্দোলনের সহযাত্রী অনেক নেতা/ নেত্রীবৃন্দ, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির প্রায় সকল সদস্য এবং বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিলের জীবন সঙ্গীসহ তার সন্তানেরা। গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি প্রতিনিধি দলও এই স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করে।

স্মরণ সভা শুরুতেই তার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। তারপরে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে সঙ্গীত পরিবেশন ও কবিতা পাঠ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক আয়েশা খানম।

ফাতেমা তুজ জোহরা

কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম-এর পুনর্মূল্যায়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার সহযোগিতায় মেহেরপুর, গাইবান্ধা, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, জামালপুর ও খুলনা জেলার ৩২টি ইউনিয়নের ৩২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। অভিযান স্থানীয় কমিউনিটি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সামাজিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্মত শিক্ষার জন্য সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী উভয় পক্ষের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক তৈরির লক্ষে এই কমিউনিটি স্কোর কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে পুনর্মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জামালপুর জেলায় সহযোগী সংগঠন "আপউস" এর সহযোগিতায় ১৭-১৮ এবং ২৫-২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদারগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর ও চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রমের ১ম পুনর্মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়।

এই পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ (এসএমসি) সদস্যদের সাথে ৩টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে ৯টি এফজিডি আয়োজন করা হয়। আলোচনায় শিক্ষক-এসএমসি সদস্য, ও অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০টি সূচকের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্কোর প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ৩টি ইন্টারফেস সভায় শিক্ষক-এসএমসি ও অভিভাবকগণ সমন্বিতভাবে চূড়ান্ত স্কোর নির্ধারণ করেন। এছাড়া সূচকের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য উভয় পক্ষ তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন। এই চূড়ান্ত স্কোর ও সুপারিশসমূহ বিদ্যালয়ের কাছে দৃশ্যমান স্থানে সবার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ৩টি বিদ্যালয়ের সূচকের পরিবর্তন/ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য ৩টি মনিটরিং দলও কাজ করছে। যারা প্রতি তিন মাসে ৪বার সভা আয়োজন করে থাকে এবং পর্যবেক্ষণ মতামত উপস্থাপন করেন।

সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ পাঁচ শতাধিক শিক্ষক-এসএমসি সদস্য ও অভিভাবক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

আব্দুল কুদ্দুস প্রিন্স

সম্মানিত পিতা-মাতা এবং অভিভাবকবৃন্দের প্রতি আইজিপির আহ্বান

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ

আপনার প্রিয় সন্তানটি এ দেশের আগামী দিনের অপার সম্ভাবনাময় একজন নাগরিক। আপনার সন্তানকে মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অভিভাবক হিসেবে যেমন আপনার তেমনি সমাজ, রাষ্ট্রের, সকলের। নতুন প্রজন্মের অপার সম্ভাবনাময় এ কিশোর ও তরুণদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সকল বিভ্রান্তি-কলুষিত ধর্মান্ধতা-কূপমন্ডুকতা হতে রক্ষা করতে সকলকে একসাথে ও একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ

সম্প্রতি বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত কতিপয় তরুণ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোঁরা এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ সংলগ্ন পুলিশ চেকপোস্টে জঙ্গি হামলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড ও নাশকতা ঘটিয়েছে। হামলাকারীদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন ধরে পরিবার থেকে কোন না কোনভাবে নিখোঁজ ছিলো বা বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এসব তরুণরা ভুল ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে ভয়ংকর জঙ্গি। তারা জঙ্গিবাদের মত ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়, হামলা করে দেশের মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণের উপর যা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক।

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদেশের তরুণরা যাতে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে না পারে সে জন্য আপনার ও আপনার পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই আপনার পরিবারের কোন সদস্য, কোন নিকট আত্মীয় অথবা আপনার সন্তান দীর্ঘদিন হতে নিখোঁজ থাকলে বা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে অবহিত করুন। এছাড়া আপনার সন্তান, পরিবারের সদস্য, নিকট আত্মীয়ের জঙ্গি সম্পৃক্ততার মত সন্দেহজনক আচরণ দৃষ্টিগোচর হলে নিকটস্থ থানার পুলিশকে অবহিত করুন।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন হতে আপনার নিখোঁজ সন্তানকে খুঁজে বের করতে ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ

আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণদের সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ ও মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ আলোকিত মানুষ হয়ে উঠার সর্বাঙ্গীণ সঠিক শিক্ষা প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বও আপনার, আমার সকলের।

আপনারা আপনার প্রিয় সন্তানটিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আপনার সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাতায়াতের স্থান, বন্ধু-পরিজন, শিক্ষকসহ হঠাৎ করে কারো প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করুন। কোনভাবে ধর্মান্ধতা ও বিভ্রান্তিকর শিক্ষা যাতে আপনার সন্তানকে সত্য-সুন্দর ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করতে না পারে সে বিষয়ে আরো সতর্ক ও যত্নবান হতে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব।

ইনস্পেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৬৬ শ্রাবণ ১৪২৩ জুলাই ২০১৬

সম্পাদক

এ মাসের প্রথম তারিখটা প্রতি বছর আমাদের জীবনে আসবে কালো দিবস হিসেবে। এদিন রাত ন'টা নাগাদ গুলশানের একটি অভিজাত পান্থশালায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের যে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটলো, তা আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করেছে। আমাদের সকলের সকল রকমের অনুমানকে ব্যর্থ করে দিয়ে মৌলতন্ত্রী জঙ্গিবাদের যে সহিংস রূপ আমরা দেখলাম, তা স্মরণ করতে গিয়ে এখনও গভীরভাবে আমরা শিহরিত বোধ করছি। মোট বাইশ জন ব্যক্তির জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে একেবারেই অকারণে। এদের মধ্যে নয়জন ইতালিয়ান, যারা আমাদের পোশাক শিল্পে বিনিয়োগকারী। এদের মধ্যে একজন প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশে বসবাস করছেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ ছিল না। একই কথা প্রযোজ্য ছয় জন জাপানী সম্পর্কে। এরা সবাই JICA-র অধীনে বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছিলেন। ঢাকার ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসনে যে মেট্রোরেল প্রকল্প নেয়া হয়েছে, তার পরামর্শক। আমাদের এমন উন্নয়ন সহযোগীদের বিনা দোষে হত্যা করার মাধ্যমে শুধু অমানবিক জিঘাংসাই প্রকাশ্য হয়ে উঠেনি, বৈশ্বিক পরিসরে আমাদের ভাবমূর্তির সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে কতদিন কিভাবে আমরা ঘুরে দাঁড়াব, সেকথা এখনই বলা যাচ্ছে না।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদের ছবি
অশোক কর্মকার

সেনাবাহিনীর কমাণ্ডো অভিযানে পাঁচ জন জঙ্গীর সবাই নিহত হয়েছে। এই পাঁচ জনই মেধাবী তরুণ শিক্ষার্থী। এদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতায় একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উদাহরণ আমরা দেখেছি বিভিন্ন বিরতিতে। সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ থেকে আদালত আক্রমণ ও মহররম উদযাপনের প্রাক-লগ্নে সহিংসতায়। কিছু কাল আগে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিশানা করে হত্যার একটা ছক দেখেছি। ঢাকার অভিজাত পাড়ায় একজন ইতালিয়ানকে হত্যা করার পর স্বল্প বিরতিতে রংপুরে জাপানী নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিরতিতে মন্দিরের পুরোহিত, খ্রিস্টান দোকানদার, আশ্রমের সেবায়েতকে হত্যা করার ঘটনার মাধ্যমে এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলা হয়েছে। এই অবস্থা থেকে আমরা সবাই মুক্তি চাই।

কিন্তু সেই মুক্তি যে সহসাই জুটবে, তা মনে হয় না। গুলশানের সহিংস প্রকল্প একটা অপ্রত্যাশিত তথ্যকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। সাধারণভাবে মনে করা হত, মাদ্রাসা -পড়ুয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পটভূমির সন্তানরা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে থাকে। গুলশান হত্যাকাণ্ড থেকে জানা গেল, সচ্ছল ইংরেজি মাধ্যমে পড়া তরুণরা সন্ত্রাসী মৌলবাদী গোষ্ঠীর দীক্ষা নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা আত্মঘাতী মিশনে অংশগ্রহণ করছে। এমন সংহারী ব্যাধি অগোচরে সমাজের নানা স্তরে বাসা বেঁধেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে এই সমাজকে স্বাভাবিক ও নিরাপদ করে তুলতে হবে। সেই প্রক্রিয়ায় একটা বড় উপাদান হতে পারে,- সুশিক্ষা।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org
Facebook page: https://www.facebook.com/campebd, **Twitter**: https://twitter.com/campebd
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8lBbGUuYku02mV12r_3lsg